ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালা সিরিজে আমার এই বই। এখানে একটি কথা বলে রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দরকারি, কোনো রচনাকে শ্রেষ্ঠ বলা তো দূরে থাক, আমি আমার কোনো রচনাকেই এ পর্যন্ত সার্থক বলে মনে করি না। এখনো কিছুই লেখা হয় নি। দৃষ্টিবিভ্রমের মতন মুহুর্মুহু সত্যভ্রম হয়, ভাষা কিংবা রূপও আলেয়ার মতন। যা লিখতে চাই, তা এখনো কিছুই লিখতে পারি নি। তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এই আর-কি!

আমার প্রথম কবিতার বই থেকে মাত্র পাঁচটি কবিতা দিয়েছি। 'অন্যদেশের কবিতা' নামে আমার একটি বই আছে, তার থেকে একটিও দিই নি, কারণ অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে আমার কোনো মোহ নেই। পরবর্তী দুটি বই থেকে যে বেশী সংখ্যক কবিতা দিতে হয়েছে তার মূল কারণ, আমার বাকি অনেক কবিতাই হারিয়ে গেছে। আশা করি, পরবর্তী কোনো কালে এসব কবিতাকেই আমি অনায়াসে পরিত্যাগ করে যেতে পারবো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

* চিহ্নিত কবিতাগুলি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

স্বাতীকে

ঝর্না-কে

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কী যেন তার গান !

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্না, জানো, তারি নাম তো বাঁচা।

তামসিক

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের কোলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ'রে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দু হাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বুকে
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি
হা-হা শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি

ছড়িয়ে দিতে বুকের বিষ আশিরপদনখে
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে
তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ,—অন্ধকার জলে
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতুহলে।

একি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল
নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

উপলব্ধি

খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেঁয়াজ রসুন
বেচে উঠলো এনামালি, গত হাটে আর-বুধবারে
দু টাকার মার গেছে, আজ শোধ নেবে চতুর্গুণ
গঞ্জের বাজারে তারা সুর্মা চোখে আছে সারে সারে।

লণ্ঠন নেভাও বিবি, বন্ধ রাখো সোহাগের বুলি
না-হয় বেশিই পাবে, আরো এক চকচকে আধুলি
ভোর রাত্রে ধরা চাই সতীশের ঘরে ফেরা নাও
থাক আজ কালীমার্কা, এক ফুঁয়ে লণ্ঠন নেভাও।

আধুলির চেয়ে আরো চকচকে তীব্র জ্যোৎস্নার
আলো এসে ঘরে পড়লো, হঠাৎ দেখলো এনামালি
অজস্র দোকানপাট বসে গেছে যেন সারে সার
লোকজন ভরা হাট শুধু তার স্থানটুকু খালি।

বিবির শরীরে দেখলো ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন দিগন্ত উধাও,
মনে হলো এতক্ষণে ছেড়ে গেছে সতীশের ঘরে ফেরা নাও।

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জেলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা
আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন্ জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস কোরো না।
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা—ছেঁড়া তাঁবু, ফাটা বাজনা, নানান সেলাই
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মারণ খেলা
খেলাচ্ছে আহা রে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না, হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার ওষুধে ভুলছে ;—বিশ্বাস কোরো না।

দেখ্ রে নিন্দুক দেখ্, বামহাতে কনিষ্ঠ আঙুলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভাষা !
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি ?
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ, চারদিকে দেয়াল রাখিনি,
(তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে
আঙুলে বয়েস গুনে—শখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি এঁকে !)

আমার বাড়িতে দেখ্ অনুগত ভৃত্যের মতন
নানান জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে ছাতের কার্নিসে
নানান রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত দিনরাত।
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে
বাইরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ!

তোরাই নির্বোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক—
আমাকে ম্যাজিকওয়ালা বললে তুমি বিশ্বাস কোরো না।

চিরহরিৎ বৃক্ষ

শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির
করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস।
আমার সাধ ছিল সেই বাতাসের ভাষা শুনি।
একদিন তাই অন্ধকার নদীর কিনারায় নিভে আসা
চিতাকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিলাম আমি, জীবন্ত।

কোথা থেকে পাখার শনশন শব্দ করে একটা বিশাল
বাজপাখি উড়ে এসে বসলো আমার শরীরে।
যে মেয়েটিকে কাল আমি স্বামীগৃহে যেতে দিয়ে এসেছি তার,
দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ নোখ দিয়ে সারারাত সেই ভয়ংকর পাখি
ছিন্নভিন্ন করে খেলো আমার শরীর, আমার চোখে মুখে বাহুতে
ক্ষত, আমার রক্তে মিশলো রাত্রির শিশির।
আমার প্রাণটাকে বার করে এনে কি ভেবে অবহেলায়
আবার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে ;
নিজের মৃতদেহে ভর করে আবার আমি জেগে উঠলাম।

তাই প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে পিতৃগৃহে আসা রমণীটি
আমাকে আর চিনবে না। আমি ঘুরবো ফিরবো গোপন
করে আমার শরীর থেকে শবের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে
স্বপ্ন দেখবো সেই শ্মশানের পাশে এক আশ্চর্য
চিরহরিৎ বৃক্ষ— তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয় না,
বাতাসের ভ্রান্তি হীন শব্দে ডাক দেয়. এসো, এসো, পাখির মতো
বাসা বাঁধো আমার আশ্রয়ে! সে আমার জন্মের
আগেও বেঁচে ছিল— আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে।

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র

কোন্ দিকে? কোন্ দিকে? আমি চিৎকার করলুম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিটকে পড়লো। তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাত দিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল এবং জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুকরো শত শত হুইস্‌ল বাজিয়ে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে। কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কি করে জানলেন এইটা ঠিক
পথ? নাকি যে-কোনো রাস্তায়!
তাদের উত্তর : পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়ট

পথ কিংবা রাস্তা আমি কোন্‌টায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম। কেননা 'পথিক' এই সুদূর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বদলে 'রাস্তার লোকটা'?

পরমুহূর্তেই, হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স্তুতি, উপমার
ভয়ংকর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর, রক্ত, দু চোখের মণি।

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু-হাত নিচে, পা শূন্যে— আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ,
চাঁদের আলোয় ?

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকরগাছি একলা শুয়েও বেঁচে তো আছি
ইষ্টকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি—
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লণ্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া তা কেবল তুমিই পারো।
আমি তোমায় চিমটি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়

তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খাণ্ডাগুলু, বুম্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্ না উম্বখুস্থ সাকিনা খিনা
মহারাজ, মনে পড়ে না ?

অসুখের ছড়া

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন্ মুণ্ডহীন নারীর কাছে ?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্রেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের ?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না-হয় স্মৃতি না-হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুল প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে বুকের গন্ধ
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না

মনে পড়ে না মনে পড়ে না— মেঘলা মতো বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিনীর কোলে ঘুমোয়।

বৃক্ষ তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গত জন্ম, তোমায় চেনা যায় কিনা
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কি অসম্ভব দৈন্য—
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে ঢোকার বুদ্ধি ঈশ্বরেরও মনে এলো না ?
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রতিমা···

হঠাৎ নীরার জন্য

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে— দিকচিহ্নহীন—
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে ? তুমি
আজই কি ফিরেছো ?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন!'
রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরির মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফ্‌টের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ…

আর্কেডিয়া

এই বিকেলটা অন্যরকম জীবন আমার ছিঁড়ে নেবো জমিয়ে
রাখবো বাক্সে
চেনা রাস্তায় ঘুরবো একটা মাঠের মধ্যে বাড়ি আমার
পকেট ভর্তি ঠিকানা

আজকে আমি নত হবো কান্না পেলে লুকোবো না
চাইনে আজ বন্ধুবান্ধব ভাববে ওরা গেছি আমি চাঁইবাসায়
কিংবা ফরাক্কাবাদ—
ওদের চক্ষু এড়িয়ে আজ পালিয়ে ফিরবো দেখবো আমি হাওয়া
তোমায় নাম জানায় কিনা অন্য রকম আর্কেডিয়া

ডবল ডেকার থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে একটা মেয়ের কাছে বলবো
তোমায় আমি ভালোবাসি বিষম ভালো যেমন ভাবে লক্ষ কোটি মানুষ
ভালোবাসে ভালোবাসায়—একটা চুমুর জন্যে মরে ছাদে লুকোয়
বারান্দার কোণে
চোখাচোখির খেলা খেলে— আমিও চাই অমনি না-হয় একটা বিকেল
অনাধুনিক হয়েই রইলুম কেই-বা দেখছে

পঁচিশ জন্ম আগে আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম
পঁচিশ জন্ম পিছন ফিরে প্রাচীন জন্মে ফিরে এলাম
তুষারমণ্ড ভেড়ার পাল ওরা কেমন খেলে বেড়ায় মেঘলা-করা দুপুরবেলা
পপ্‌লারের বনে শব্দ ঝর্না থেকে প্রতিশব্দ ভ্রমর কিংবা ঝর্না
বাঁশি কোথায় ? লুকোস্ না রে দে ভার্জিল চেনা সুরটা বাজাই একলা—
চতুর্দিকে বাঁশির গন্ধ আকাশ থেকে বাঁশির গন্ধ টিলার উপর দাঁড়িয়ে—
এমন শান্ত সমাধিটা আমার দেখো আমিও ছিলাম আর্কেডিয়ায়
আমিও ছিলাম
ন্যাথ্‌ ভার্জিল আজও আমায় বাঁশি হাতে মানায় কিনা !

আটাশ বছরে

মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা শেষ হয়
তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না

জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়
বিবাহিতা রমণীরা সিঁড়ির উপর থেকে চকিতে দাঁড়িয়ে
যেন বহু কষ্টে কেনা
মুণ্ডহীন হাসি দিয়ে চলে যায় ঝুলবারান্দায়,
এখন প্রত্যেক দিন দাড়ি না কামালে আর বাঁচে না সম্মান,
রক্তের সমুদ্রে এক দ্বীপ আছে সেখানে স্টিমার ছাড়ে সঠিক দশটায়।

সকালে কলম দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙেছি একটা ভিমরুলের বাসা
বহুক্ষণ একা একা ঘুরে ঘুরে উড়ে গেল করুণ ভিমরুল
(ওদেরও ললাটে দেখছি শিল্পী-মার্কা দুঃখের জরুল !)
বিশাখার জন্মদিনে সন্ধেবেলা জমবে এক বিষম তামাশা
সেখানে ভিমরুল-তত্ত্ব জানতে হবে, অথবা হাজির হবো
ছোক্‌রা অধ্যাপকের বাড়িতে
এবং লুকিয়ে আমি সিগারেট জ্বালতে গিয়ে অতিশয় যত্নে সাবধানে
সদ্য-কেনা বেডকভার নিশ্চয় পুড়িয়ে আসবো ওর, অতর্কিতে।
স্টোভের শব্দের মতো কি যেন রয়েছে অবিরল এই বুকের মাঝখানে।

তাস খেলতে কৃপা লাগে, বিরলে সময় পোড়ে সিগারেটে শুধু কিছুক্ষণ
জেতায় আনন্দ নেই, হেরে গেলে ক্রোধ আসবে কবে ?
কুমারীরা চিঠি লেখে, আমার হৃদয়ে নেই রক্তের ক্ষরণ
বাথরুমে নগ্ননারী হঠাৎ দেখলে আজ শরীর কাঁপে না
জানলার পুরনো শিক্‌ ভেঙে ভেঙে স্বর আসে উদাস মন্ত্রের—
মৃত্যুর অতীব কাছে দিন কাটিয়েছি আমি অনেক উৎসবে।
তুমড়ানো, পায়ের নিচে পড়ে থাকে, পাণ্ডুলিপি, শিয়রে গ্রন্থের
অগোছালো স্তূপ থেকে ভেসে আসে শবের দুর্গন্ধ।

সিঁড়িতে বিষম অন্ধকার, আঃ, ঘড়ির শব্দের মতো এমন কুৎসিত
আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে— অম্নিত, অম্নিত !

তোমার বাড়িতে আজ থাকতে দেবে ? চলে যাবো কাল ভোরবেলায়
অতীশ অমল ওরা— লুকিয়েছে সংসারের রুক্ষ ঝামেলায়
পত্নীর স্তনের বোঁটা থেকে ঠোঁট তুলে এনে মধ্যরাতে এখনও অমিত
পুরনো বন্ধুর মুখ তোমারও কি দেখতে সাধ নেই ?

শুধু কবিতার জন্য

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক ;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে লোভ হয় ।
মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি ।

রাত্রির বর্ণনা

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শেষ রাত্রে গোপনে ফিরবেন
দ্বার খুলে দিও রক্ষী, ঘুমের অপর নাম মৃত্যু, মনে রেখো ।
ততক্ষণ দাসীদের সঙ্গে কিছু মস্করায় সময় কাটাতে পারো হয়তো,
রূপসী রমণীদের সব দিতে পারো, শুধু দৃষ্টি বাঁধা দিও না ক্ষণেকও ।

পৃথিবী দেওয়ালে ক্ষুদ্র, গুমরে ওঠে বন্দীশালা, কিন্তু দেখো
চোখের তারায়
একটি সহস্রদল নীলপদ্ম ফুটে আছে, রাত্রির আকাশ—
অথবা সমুদ্র বুঝি সহস্র মন্দার পুষ্পে, প্রতীক্ষায়, সজ্জিত হয়েছে
একটি দেবদারু বৃক্ষ চিরকাল একা থেকে শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর
সুচারু নিঃশ্বাস।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে, হে প্রহরী, রক্তের গমনধ্বনি কখনো
শুনেছো ?
যারা ঘুমে ঢলে আছে, তারা সব মৃত-রক্তে,
অন্ধকারে মগ্ন থেকে যাবে
তিন বেদনার দীক্ষা নিঃস্ব বাদুড়ের মতো শূন্যপথে দিয়ে যাবে
নির্লিপ্ত ত্রিকাল
তোমার ললাট জ্বলবে নীল-শিখায়, দুই চক্ষে রহস্যের
অন্তরাল পাবে।

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শোন রক্ষী, খুলে দিতে হবে সিংহদ্বার
তক্ষক ইন্দ্রিয়বর্গ যেন না লুকায় ইতস্তত
জীবনের ধৃতি-রূপ তিনটি আদিম দুঃখে শস্ত্রপাণি হয়ে থেকো তুমি
অকস্মাৎ বুঝতে পারবে সব পদপাত শব্দ, শোণিতপ্রবাহ অন্তর্গত।

চোখ বাঁধা

অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো, আলো,
অরুন্ধতি, আলো—

চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইটহাউস্ হয়ে
দাঁড়াবে না ?

বুকের উপরে দুই পা, ফ্লুরোসেণ্ট উরুদ্বয়,
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে,—কেন এত রূপ ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য,
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়—
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবনসর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি !

যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবো, সেই ভালো, একটা চোখ
ছুঁড়ে দিও জলে—
বড় সাধ ছিল আমি স্বর্গে যাবো, মুখ লুকাবো এমন বুকের
ছায়া আছে আর কোথায়, নেই পৃথিবীর উপবনে, নেই রেখাচিত্রে
মাংসের হরষে
না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়, যেন ঘোরে
প্রতিশোধে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়,
মহাশূন্যে, সর্বনাশে
আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের
অশ্রুপান করি।
আমিও পৃথিবী, স্বর্গ, কলেজ স্ট্রীটের মহা অগ্নিকাণ্ড দেখে
শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙেচুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই
তোমার শরীর শিল্প, আমার শরীর শিল্প, অরুন্ধতি তোমার আমার।

বায়ু, তুমি

বায়ু, তুমি আমাকে পবিত্র করো, আমার প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে ডাক দাও, ডেকে বলো, প্রতিটি বিষণ্ন জন্ম। ওদের প্রত্যেককে স্নান করিয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে সুগন্ধ দাও—যেন আর কোনোদিন অন্ধকার সিঁড়ির নিচে অতর্কিতে ছুরি হাতে না দাঁড়ায়—।

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, 'ঐ যে রুগ্ন ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন ?' কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি, 'এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন ? গত বসন্ত মেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে,
সব ঘরে
ধুলো, তালা খুলবে না এ জন্মে ; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ !'
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহু দূর জেনে, চৈত্রে রুক্ষ দিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানে কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।

আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া,
কব্জিশক্তিধর
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ংকর

সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস—
ক্ষণিক সরাইগুলি, হায়! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।

জুয়া

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেটবই, রুমাল—
রেডিওতে পাঁচটা বাজলো, আচ্ছা কাল
দেখা হবে,— বিদায় নিলাম,— সন্ধেবেলার রক্তবর্ণ বাতাস ও শেষ
শীতের মধ্যে, একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার
সময় মনে পড়লো— ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গী ও দুঃখ, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।

হাল্কা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি নিখিলেশ হয়ে বহুদূর
হেঁটে গেলাম, নতুন গোধূলি ও রাত্রি, বাড়ি ও দরজা এমনকি
অন্তঃপুর
ঘুমোবার আগে চুরুট, ঘুমের গভীরতা ও জাগরণ—
ছ' লক্ষ অ্যালার্ম ঘড়ি কলকাতার হিম আস্তরণ

ভাঙার আগেই আমি, অর্থাৎ নিখিলেশ, টেলিফোনে নিখিলেশ

অর্থাৎ সুনীলকে

ডেকে বলি, তুই কি রোজ কণ্ডেন্সড্ মিল্কে

চা খেতিস্? বদ গন্ধ, তা হোক! আমি অর্থাৎ পুরনো সুনীল,

নিখিলেশ এখন,

তোর অর্থাৎ পুরনো নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন

এবং হৃৎপিণ্ড ও শোণিত

পেতে চাই, তোর পুরনো ভবিষ্যৎ কিংবা আমার নতুন অতীত

তোর নতুন অতীতের মধ্যে, আমার পুরনো ভবিষ্যতে

(কিংবা তোর ভবিষ্যতে আমার অতীত কোনো পঞ্চম

অতীত ভবিষ্যতে)·

কিংবা তোর নিঃসঙ্গতা, আমার না-বেঁচে-থাকা হৈ-হৈ জগতে

দু-রকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন বদলের

বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের

আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস

জীবনের তীব্র চুপ, যে-রকম মৃতের নিঃশ্বাস,—

লোভ ও শাস্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা

তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমিও অগত্যা

প্রেমিকের দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়,

ধ্যান ও অস্থিরতা

এক জীবনে, ঊরুর সামনে ঊরু, ঊরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ,

অশরীরী,

ঘৃণা ও মমতা,

অসম্ভব তাণ্ডব কিংবা চেয়ে দেখা মুহূর্তের রৌদ্রে কোন কুরূপা অপ্সরী

শীত করলে অন্ধকারে শোবে, দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে

সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরনো আমার নামে,

দেখতে চাই চোখে

একশো আট পল্লব কাঁপে কিনা, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে

ক'হাজার আলপিন, কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,

সুখ, সুখ নয়, পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না,
মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়,
এক জীবন দৌড়োতে দৌড়োতে।

শব্দ : ১

তখন দরজায় স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ—
মাতৃজঠরের
ভিতরে শিশুর হাসি, সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দু-দিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহুলক্ষ ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠহীন, বারান্দায়
শার্ট প্যাণ্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে
ডাকবাক্সে চিঠি ছিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাস্যকর, শুয়ে আছে টেবিলে ধুলোয়—
এমনকি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে হাসি, কান্না-ক্রোধ
পোকার মতন
খেলা করে, টেলিপ্রিণ্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট, মন্ত্রী, বন্যা
থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে প্রতি-নায়িকার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজ্ঞাত শিশুর হাসি ; এবং ঘড়ির
গূঢ় আলোচনা, দূরে ফুল ফোটার কলরব, জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

জ্যোৎস্না নিবে গেলে তবু অন্ধকার নেই, আর শব্দ থেমে গেলে
তবু অমোঘ গোলমাল

জেগে থাকে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করা ভালোবাসা ঘুমোতে পারে না
কবিতায়। স্বপ্নে, শোকে, কুমারী মেয়ের গন্ধে বিরক্ত বাতাস
চতুর্দিকে, সব মানুষের মুখ ভাঁটফুলের মতন অশ্লীল মনে হয়,
আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই, আমার জন্মের শব্দ—
প্রথম দিনের সেই প্রিয় শব্দ মনে আছে, কিংবা মনে নেই !

আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল ; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় পাই, বহু রাত্রি জাগরণ—প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে—তোমার নিশ্চিত
পথ্য হবে।

*

আমার **সঙ্গম** নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী ;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধা, কিছুটা উপরে, সার্থকতা যদি উদাসীন ;
বিপুল তীর্থের পুণ্য— নয় ? সর্বগ্রাস
যেমন জীবন আর জীবনী-লেখক।

*

প্লেনের ভিতরে বসে কেঁদেছিলাম
আমি মানুষের **কান্না** এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুকের মধ্যে।

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘুমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন ?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন !

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠাণ্ডা বা গরম নয়, অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দু হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
সিগারেট না থাকলে আমি দু হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নয়, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বুঝি, আমি
দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে
ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা—

ফুলের ? না ফসলের ? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়ার্কির
টিকিট হয়েছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী···
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানলায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে।

রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিঃশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম ! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি, ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম

ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো ? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এ-রকম ছিল…
কিংবা গান ? বাথরুমে আয়না খুব সাংঘাতিক স্মৃতির মতন,
মনে পড়ে বাস-স্টপে ? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে— স্বপ্নে, বাস-স্টপে
কোনদিন দেখা হয়নি, ও সব কবিতা ! আজ যে-রকম ঘোর
দুঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দুঃখ, দুঃখের প্রভূত দুঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দুঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোন দুঃখ নেই, নীরা
বুকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছুটা দুঃখ বুকের সিন্দুক খুলে, যদি
হাত ছুঁয়ে পাওয়া যেত, হাত ছুঁয়ে, ধূসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দুঃখ-না-থাকার-দুঃখ… । ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয় !

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে, তোমার নিষ্কৃতি নেই, তোমার গরিমা
একা গোধূলির যূপকাষ্ঠে চলে যাবে, আগুন ও পৃথিবীর দেহ, শব
আগুন ও পৃথিবীর দেহের ভিতরে শব্দ, তুমি নীল শব্দগুলি
ধূসর করেছো
তোমার নিষ্কৃতি নেই, তুমি ভেঙেছিলে ভীল রমণীর প্রগাঢ় তামস—
জ্যোৎস্নায় মাদুর পেতে যারা পিক্‌নিক করে, যারা হাসে,
ধুলো ছোঁড়ে, ধুলো হয়
বিমানপতন কিংবা নেহরুর মুখের ওপর বিস্কুটের গুঁড়ো, ঝোল,
বোতলের চাবি
সবাই নিঃশব্দ ; দশ দিকে ন'জন বন্ধু ছুটে যায়, সিল্কের আঁচলে
দেশলাই, তবু কারো
দৃষ্টির উত্থান আগুন ও পৃথিবীর দেহে নয়, শব্দে নয়— মহুয়া ফুলের
ছায়ায় প্রস্রাব করে একজন, একজন প্রণাম করে— তরুণ বৃক্ষটি
দু-জনেরই দিকে হেসেছেন—

তখন কোথায় ছিলে তুমি, কোন্ পাপ ও দুঃখের মতো অদ্ভুত শীতল
সমতটে ? তুমি শব্দ, তুমি হেম, তুমি প্রেত, তুমি মুখশ্রীর
সর্বনাশ কারখানায় লিপ্ত থেকে শুক্র গন্ধ, বুক-ছেঁড়া হাসি ও স্বপ্নতা—
তোমার নিষ্কৃতি নেই, মৃত্যুর দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুর অনেক আয়ু
যেমন গভীর
শৃঙ্খলের পদশব্দ, পরিণতি, কাতর নিঃশ্বাস অরণ্যের মেঘ থেকে
আসে, যায়, ঘোরে—
শোনে প্রত্যেক কীর্তির ভাঙা গলা, বাতাস অতীব লঘু যেমন শ্মশানে—
শ্মশানও নিবন্ত আজ, চতুর্দিকে পড়ে আছে চণ্ডালের হাড় !

হিমযুগ

শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে···
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।

আমার নিঃশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে—
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জঙ্ঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা·
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরো দিন পর
অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর
তুমি হও নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, ঠাণ্ডা, দেবদূতী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।

মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমি প্লেগ, পরমাণু
কিছু নয়,
স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখাবার নিয়ম হয়েছে
মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে
ভুল স্বপ্নে ; শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
তুমি কথা দিয়েছিলে…
এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো ! নয় রক্তে অশ্বক্ষুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা
উরুর শীৎকার
মোহমুদ্গরের মতো পাছা আর তুলিও না, তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্যে দিয়ে,— চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো —
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো
উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙীন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাশের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিঃশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়

শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে······
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, এক শো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসি সমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলাম-
ওয়ালা 'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কী করছিস ?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরন দেখি, দু'হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্, বাড়ি চল্ কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে ?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু'চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি ; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে ? যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা.— যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস ?' 'জানি না' এ কথা
কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বারবার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়

লুকিয়ে রেখেছে আমায়! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিত্তমানতায়
পরস্পর ছায়া এ মূর্তি…আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ, না ভালোবাসা
শুধু নির্বাসন।

অবেলায়

আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর
অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে
মানুষ না প্রতিবিম্ব? অবিশ্বাস না মায়ার শোক?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, মানুষ ও মেয়েদের পাশাপাশি হাঁটে।

জ্বলন্ত জিরাফ

শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে? বাথরুমে— ছ'মাস আগে, সেই থেকে চোখে ভালো দেখতে পাই না। সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগে ছিল—এ ছাড়া চোখের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে। সেই ঠাণ্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচো করেছি জানলা দিয়ে। প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালো : এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও। তার ছোটো বাড়ির রং . শাদা ছিল।

পুলিশ এসে বলেছিলো, এই নিয়ে সাতটা খুনের জন্য তুমি মোট তেরোটা ছুরি ভেঙেছো। ইস্পাতের এ-রকম অনটনের দিনে তোমার অমন বিলাসিতা। এর পর থেকে তোমার ঐ খামখেয়ালীর জন্য যত খুশী সিল্কের রুমাল বা ধুত্‌রোফল ব্যবহার করতে। কিন্তু ইস্পাতের অপচয়ের মতো বে-আইনী। দু'বছর অন্তত ঘানি ঘোরাতে।—আমার ঘড়ি ছিল না বলে ক'টা বাজে দেখার জন্য আমি মণিবন্ধটা কানের কাছে। রক্ত চলাচলের স্পষ্ট শব্দ ও সময়।

টেলিফোন মিস্ত্রী অভিযোগ জানালো, আমার ঘরে রেডিও নেই কেন। সরমা অনুযোগ করেছিল, আমার ঘরে কোনো ছবি নেই। আমি ওকে টেবিলের সম্পূর্ণ খালি সতেরোটা ড্রয়ার দেখিয়েছিলাম। ও দূরের জ্বলন্ত জিরাফ একেবারে লক্ষ্য করেনি। সেই পাপেই ওর মৃত্যু হলো। দাঁতের ডাক্তার আমার পায়ে ঘা করে দিয়েছিলো বলে আমি আর কখনও সেই শুয়ারের বাচ্চা বীজাণুসমন্বয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি। তার বদলে আমি এখন পেচ্ছাপ ও কান্নার সম্পর্ক নিয়ে বই লিখছি। এখন রাত্রি কি দিন চেনা যায় না।

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না
আয়না
    ভেঙে
        বিচ্ছুরণ
            একদিন
                বিস্ফোরণ হয়

বুক ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলি ছুটে যায় ধুসর অস্তিমে
স্বর্গের অলিন্দে—
স্বর্গ থেকে
তারপর ঢলে পড়ে
মহিম হালদার স্ট্রীটে
প্রাচীন গহ্বরে
মধ্যরাতে।

জানলা ভেঙে বৃষ্টি এলে বুকে যে-রকম পাপ হয়
যে-রকম স্মৃতিহীন মহিম হালদার কিংবা আমিও মোহিনী
পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-শরীর চরিত্র নদীর…
দীপকের মাথাব্যথা হাঁসের পালক ছুঁয়ে হাসাহাসি করে
যে-রকম শান্তিনিকেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই
দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়…
যে-রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে—

নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।

আরো নীচে, পাপোশের নীচ এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজন্মা বালিকা—
ছাদে পায়চারি করে গিরগিটি,
শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বলা ঘরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়—
থুতু ও পেচ্ছাপ সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে—

এ-রকম ছবি দেখে বাতাস অসহ্য হয়, বুকের ভিতরে খুব
কশা অভিমানে
শব্দ অপমান করে— ভয় আমাকে নিয়ে যায় পুনরায় দক্ষিণ নগরে
মহিম হালদার স্ট্রীটে ঘুরে ফিরে ঘুরে আমি মহিম, মহিম
বলে ডাকাডাকি করি, কেউ নেই, মহিম, মহিম, এসো তুমি আর
আমি ও মোহিনী
ফের খেলা শুরু করি, মহিম ! মোহিনী !
কোনো সাড়া নেই। ক্রমশ গম্ভীর হয় বাড়িগুলি, আলো
হাড় হিম হয়ে আসে স্মৃতিনষ্ট শীতে।

প্রেমবিহীন

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো, তবু জানি চিরদিন
এ পথ থাকবে এমনি নিখুঁত, কেউ আসবে না, জনহীন, প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে।

রূপ দেখে ভুলি কী রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে ? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জলে কে বাঁচাবে তবে ? এ-হেন সাহস
নেই যে বলবো, যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস

নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও !

টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুলসম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু' চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার
পূজায় বসবে ? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভীরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও !

তোমার ও রূপ মূর্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ ।

রাখাল

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অনন্তকাল
আমি ডাইনে তাকাই পিছন ফিরে অন্ধকার গলিতে
অনন্তকাল পিছনে নয়, ডানদিকে নয়, সবুজ ও লাল—
সুখের মতো ভূবিস্তৃত, ঊরুদ্বয়ে শোকের মতো, দৃষ্টি থেকে ঘুমের মতো
পেরিয়ে যাই, কুসুম এবং ফলের কাছে বীজের মতো
দীক্ষা নিতে,
মৃত্যু থেকে সঙ্গোপনে শূন্য ঘরে, দ্রাক্ষাবনের
ছাই বাতাস, জ্ঞানী মাথার খুলি, নদীর ভাঙা পাড়ের শুকনো পাতা—
পেরিয়ে যাই মাঝরাতের পাঠশালার হাজার চোখ, ধূসর খাতা,

পেরিয়ে যাই ভূমিকম্প, সূচের সরু গর্ত দিয়ে অনন্তকাল
রেশমী প্যান্ট, কোমরবন্ধ, হাতে চুরুট ; তবু আমায় বলো, 'রাখাল'।

কয়েক মুহূর্তে

কোনোদ্বিধানেইআমি **অসম্ভব** ভালোবাসাএইমাত্রতোমারচিবুকে
রেখেএলুম   ১১টা১০এ চোখঘুমেযদিঅতনা জড়াতো
পৃথিবীর সবদরজাখুলেআমি **অসম্ভব** শব্দশুনে **অসম্ভব** ধবলমিনার
প্রতিনিধিরেখে তুচ্ছএকযৌবনেরপুণ্যফলে
তোমারদ্বিধারমধ্যেচলেযেতাম   ভয়নেই ১০৮ চুম্বনের দাগ
থাকবেনাসকালে ওইবুকেরভিতরেমণিচুরিযায়নি
বুকশুধুমুখেরগরমে
কিছুক্ষণডুবেছিলযোনিরভিতরেজিভলবণেরস্বাদছাড়াআর
কিছুইআনেনি   তবু **অসম্ভব** ভালোবাসাবাসিহোল **অসম্ভব**
এইনিয়েতোমাকেআমার
একুশটাপুনর্জন্মদেওয়াহোল এতমৃত্যুমানুষেরওজানাছিল

একটি কবিতা লেখা

প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে ?

একদিনে লিখিনি। 'প্রতিধ্বনি' শব্দটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অবাস্তব ভাবে মাথার মধ্যে কয়েকদিন ঘুরঘুর করতে থাকে। শেষ কবিতা লেখার দেড়মাস

পর। কী সাধারণ কথা এই প্রতিধ্বনি, তবু তারও একটা দাবি টের পাই। অসহায়ের মতো আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, তৎক্ষণাৎ কোনো কবিতা লিখতে আমার ইচ্ছে না। কিসের প্রতিধ্বনি তা জানি না। জীবন কাটছে কী রকম—অবিরল দুপুর, বিদেশের চিঠি, পয়সা নেই, সন্ধেবেলা থেকে মধ্যরাত্রি অসম্ভব চোখ বুজে ছোটাছুটি, অপরের কবিতায় ঈর্ষা, পুলিশের প্রতি হাসাহাসি। প্রতিধ্বনিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ খুব দূরে পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চিত তা হলে স্বর্গে, আমার ব্যক্তিগত দূত। প্রথম লাইনটা তৈরী হয়ে যায়। যেন প্রতিধ্বনিকে বলেছিলাম, তুমি স্বর্গে যাও, গিয়ে বলো, আমি আসছি।

বাঙ্গুর কলোনি দিয়ে দুপুরে হাঁটছিলুম। পাশের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল হয়তো, আমি দেখিনি। 'কোনো কবিতা লিখেছো, সুনীল'? না, মাত্র একটি লাইন ভেবেছি। অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নীরেনদা বললেন, 'দাঁড়াও, ওই ছেলেটির একটা বল করা দেখি, তারপর তোমার—।' মাঠের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা রোগা ছেলে বেজির মতো ছুটে এসে হলুদ বাড়ির দেওয়ালের দিকে বাতাপী লেবু ছুঁড়লো। ইম্বল কোথায়? আমি তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। 'বলো, তোমার লাইনটা।' বলে, আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করি, 'দিকে'র বদলে 'পানে' বসালে কেমন হয়? স্বর্গের পানে? 'আমার মনে হয় তোমার 'দিকে'ই বসানো উচিত, কেননা',...আরও কিছু কথা হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় লাইনটা পেয়ে গেছি। **'কেন ফিরে এলে?'** যেহেতু না ফিরে উপায় নেই। যেহেতু আমার সময় পূর্ণ হয়নি। প্রতিধ্বনি এখনও পুণ্যগর্ভা হয়নি। পূর্ণ না পুণ্য? যা-ই হোক, ও দুটো একই। অর্থাৎ এবার কবিতাটা না লিখে আমার উপায় নেই।

বাড়ি ফিরতে অনেক বেলা হলো। স্নান করে খেয়ে টেবিলে বসবো ভেবেছিলাম। সিগারেট নেই। ভাতের পর সিগারেট না টেনে কবিতা লেখা? বাইরে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে হাতের সামনে একটা বাস পেয়ে কলেজ স্ট্রীট চলে যাই। বিকেল থেকে তারপর অন্ধকার। পরদিন সকালে প্রণবেন্দু ও উৎপল এলো। আমরা তিনজনে মিলে ছ'জন মানুষের গলার আওয়াজ শুনলুম। আর একটু থাকবেন? না। তুমি এখন বেরুবে? না। অলিন্দের কবিতাটা লেখা হয়ে

গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই কপি করে—। তখনও তৃতীয় লাইনটা পাইনি। দুপুরে দীর্ঘ মিছিলের পিছনে পিছনে মন্থর বাস।

আবার সকালে, চা খাওয়া হলো, প্রচুর সিগারেট হাতে, তন্নতন্ন করে কাগজ পড়াও শেষ হয়েছে। এবার—? এবার মুখোমুখি হতেই হবে। হাতের সামনে প্রথম শাদা কাগজে ঝট্ করে লাইন দুটো লিখে ফেললুম। লিখে অনেকক্ষণ বসে থাকি। তৃতীয় লাইন নেই। যে-কোনো কবিতার তৃতীয় লাইনই বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত। এভ্‌রি থার্ড থট্ ইজ মাই কিলার—, না, আমি তখন জ্বরের ঘোরের মতন ঐ দুইটি লাইন আবার লিখি :

প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে

কেন ফিরে এলে

এবার প্রতিধ্বনির পর একটা কমা দিয়েছি, শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিইনি।

এই আমূল নশ্বর, শূন্যমায়, শরীরের কাছে—

একটু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই এই লাইনটা মনে পড়ে। 'আমূল' শব্দটা আমি পাই একটা মাখনের (খালি) টিনের প্রতি চোখ পড়তে। কিন্তু সেই সময় আমি পেচ্ছাপ করতে যাই। সুতরাং, ও শব্দটা বসাতে ইচ্ছে হলো পুরুষের পুরুষার্থ অর্থে। শুধু শরীরই নশ্বর নয়, ও জিনিসটা আরও আগেই নশ্বর যে। 'শূন্যমায়' শব্দটা কেন বসিয়েছি, ফ্র্যাঙ্কলি, জানি না।

পবন-পদবী তুমি, প্রতিধ্বনি, শরীর ও রাত্তিরের চোখ-মারামারি

তোমার না দেখা ছিল ভালো

পবন-পদবী শব্দ দুটো কি খুব ভারী হয়ে গেল? হয়তো। লাইনটার গতি ঠিক রাখার জন্য অনায়াসেই হাওয়া বা বাতাস আরূঢ় বসাতে পারতুম। দুটি শব্দেরই শুরুতে 'প', সামান্য একটু ধ্বনিমাধুর্যের লোভে পড়লুম, বুড়ো বয়সে চুরি করে কণ্ডেন্সড্ মিল্ক খাবার মতো, গোপন লোভে ও শব্দ দুটোই রাখা হলো। লিখতে লিখতে হঠাৎই অন্যমনস্কভাবে বুধবার রাত্রির কথা মনে পড়ে, অন্ধকার ময়দান, প্রমত্ত বান্ধবদল, ঠাণ্ডা লোহার রেলিংএ হেলান দেওয়া সেই কস্তাড়ুরে লাল রঙের শাড়ি পরা ধরা-মেয়ে, তার পাগলাটে হাসি, শরীরে অদ্ভুত গন্ধ। আমি রাত্রির থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কবিতায় আনতে চাই, তখনই উপরের

লাইনটার শেষ অংশ মাথায় খেলে। পরের লাইনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আসে :

উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে এসেছিল শাদা হাঁস জ্যোৎস্নাময়
তারা নয় বাদামী অসুখ, নয় বুকের ভিতরে রাখা মুখ
মুখের প্রথম গুরু চোখ তার অসম্ভব জোচ্চুরিতে অর্ধেক স্তব্ধতা
জিতে এনে, রানীকে জানাতে চেয়েছিল, বহু রানী ও নারীর কাছে
শিখে এসে অপরূপ উরু ব্যবহার,—
মৃত্যু হাঁটু গেড়ে বসে সে সমস্ত নোট করে গেছে।

কারা বারবার ফিরে আসে? যেমন জ্যোৎস্নার হাঁস ও মাথাধরা ইত্যাদি। আমার মাথাধরার রং বাদামী। বুকের মধ্যে সবারই একটা গোপন মুখ রাখা আছে। আমি তার চোখ দেখতে পেলাম। চোখ অতিশয় বাচাল, যদি না সে অর্ধেক স্তব্ধতা জয় করে নিতে পারতো। এ সবই তো বলাই বাহুল্য। বস্তুত, আমি নারী লিখতে গিয়ে ভুল করে রানী লিখে ফেলি। তারপর রানীকে কাটতে গিয়ে রাজ-রোষের ভয় হয়। রানী শব্দটা দেখতেও বেশ। রেখে দিই. মনে হয়, সব নারীই তো আসলে রানী। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, না, ঠিক নয়, সব নারী নয়। সুতরাং পরে দুটোকে আবার আলাদা করে সরিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর কথাটা অকারণ খেয়াল। লিখে ফেলেই খুব হাসি পায়। একলা বসে খুকখুক করে হাসি। মৃত্যু আজকাল হয়েছে অবিকল খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো। খাঁটি স্ক্যাণ্ডাল-মঙ্গার একটি। যে-কোনো গুজব শুনেই এসে হাজির হয় এখন, সর্দি-কাশি-মাথাধরা, টিটেনাস—কিছু একটা হলেই খাটের পাশে এসে দাঁড়াবে। কি রকম হাঁটুগেড়ে বসে শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিচ্ছে!

স্পেস্। অর্থাৎ আবার বাড়ি থেকে বেরুতে হলো। পরের লাইনগুলি তখন ছায়ামূর্তির মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মাঝরাত্রে জাগ্রত মানুষের ঘরের জানালার ঝিল্লিতে যেমন স্বপ্নেরা অপেক্ষা করে (এই উপমাটা আমার বারবার মাথায় আসে)। ডালহৌসিতে তারাপদ হাত ধরে টেনে রেখেছে, ও ওর ভবিষ্যৎ জীবনের কিছু কথা জানাতে চায়, কিন্তু আমি তখন আমার গোপন গত জীবন নিয়ে বিষম বিব্রত, হাত ছাড়িয়ে চলতি ট্রামে লাফিয়ে

উঠলুম। সকালে প্রণব সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি, যখন হাসপাতালে ডাক্তার আমার ডান হাত থেকে এক সিরিঞ্জ রক্ত টেনে নিচ্ছিল। একঘণ্টা পর বাড়িতে, প্রথমেই মনে পড়ে, 'তোমাকে বিদায় দিয়ে' :

তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি পরশয্যায়, ঘর্মাক্ত
স্তনের দুধের আঠা, মাসের তিনদিন রক্ত, প্রতিশোধ, ঘুম অন্ধকারে
বিস্মৃতির পদশব্দ, বৃষ্টির মতন দ্রুত পাঁইট, বহু বুকখোলা
হা-হা শব্দে, ভিজে
অতি ঐশ্বরিক কোনো প্রাণীর মতন লিপ্ত হয়েছিলাম, অয়ি প্রতিধ্বনি,
তুমি তো স্বর্গের দিকে—আত্মার সরল শব্দ, মেঘ, মায়া পাহাড়
পেরিয়ে
ঘাই হরিণীর ডাক যেমন সমুদ্রে পাড়ে ফেরে···

'ঘাই হরিণীর',—শব্দটা জীবনানন্দের থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, কিন্তু আর উপায় নেই, সময় নেই, অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এ কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। আজ বিকেলে কথা রাখতে হবে। কিন্তু উঠতে পারছি না, মন বলছে, আর একটা লাইন বাকি আছে, শেষ লাইন। পরপর বিদ্যুতের মতো আঠারোটা লাইন মাথায় এলো, রেলগাড়ির কামরার মতো, একই রকম দেখতে অথচ এক নয়। খিদে-পেটে কী সমস্ত চমৎকার লাইন যে মাথায় আসে, অথচ খেয়ে উঠে তার একটাও মনে থাকে না। কিন্তু ওগুলো এ কবিতার লাইন নয়। একটা পুরোনো লাইনই বারবার দাবি জানাচ্ছে। হ্যাঁ নিশ্চিত, তুমিই এসো :

'কেন ফিরে এলে ?' কেন ফিরে এলে ?

নীরা তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো ?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে

রেলিং-এ দুই হাত ও থুত্‌নি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পদ্মপাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু' দিন
দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুবই রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু' দিন—
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেমন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টি বার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা।

তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
দু' হাত জোড় করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ—
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু' দিন।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো!
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছলছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি;
দোল ও সরস্বতী পুজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম ? নাকি শেষ
পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত ; আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে । আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে ; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জেলে—
(ও গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই !)

আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ীর ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি । নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি ? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে
বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশী ছিল কি না ;
আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না ।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

নিখিলেশ, আমি এই রকম ভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার—এ কি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুবসাঁতার ?—অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন ? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমনিরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা ? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয় । মৃত গাছটির পাশে উত্তরের

হাওয়ায় কিছুটা মায়া লেগে আছে ! ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বাণ্ডিল, তবুও অক্লেশে
হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি । আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি…, ব্যক্তিগত জীরো আওয়ার ;
ইচ্ছে ছিলো না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে । তবু, ক্রমশই বেশী করে আসে শীত, রাত্রে
এ-রকম জলতেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাতড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর । ইঁদুর নয় মূষিক ? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদূরেই সংস্কৃত শ্লোক ? পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই
অবেলায়
কিছুই মনে পড়ে না । আমার পূজা ও নারী হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন । নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছেমতো
কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের । আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় এক পলক সত্যি চোখ । এ-রকম সত্য
পৃথিবীতে খুব বেশী নেই আর ।

অমলের স্ত্রীর জন্য

আমি খুব দূর, দূর দেশ থেকে অলক্ষ্যে বাণ ছুঁড়ি
তুমি কাছে এসে এক কণা কস্তুরী
তুলে নিলে করকমলে
সখী, আজ আর আমাকে বোলো না নিষ্ঠুর হতে
আমাকে বোলো না অমলের
শবযাত্রায় কাঁধ দিতে, আমি আজ গঙ্গার স্রোতে

থুতু ফেলবো না, দেখো এই মুখ, এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
আমার শরীর, দেখো, চেয়ে দেখো, এ কি মনে হয়
বারুদে ভর্তি সিন্দুক ?

দেয়ালের পাশে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
খুব বড়ো ঘর, আধো-নীল কোনো দেয়ালে—
তুমি নও কিছু রূপসী, তোমার চোখ ছোটো,
শুধু হঠাৎ কখনও খেয়ালে
হেসে ওঠো পাগলিনীর মতন, একলা ঘরের দেয়ালে—
রোদ এসে পড়ে চিবুকে তোমার দুঃখ জানায়
দুঃখে দেয়ালে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
দুঃখ তোমার গন্ধের মতো ফেটে পড়ে ঐ দেয়ালে—
আমাকে বোলো না নিষ্ঠুর হতে, আমাকে বোলো না অমলের
মৃত্যু সইতে, মৃত্যু আমায় অসুখ দেয় না কাঁপায় না বুক
সখী, আমি আজ তোমার ও করকমলের
কস্তুরী নোবো, দেখো এই মুখ এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
মৃত্যু আমাকে অমৃত দেয় না কাঁপায় না বুক
আমি আজ কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো তোমার অসুখ।

আমি ও কলকাতা

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশিয়ে খাওয়াবো—
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত উপপতি
তোমার দিনে দুপুরে, উরুতে সম্মতি !
দিল্লীর সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি ? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধেবেলা
প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাক্সিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো
ক্যামেরা
যদু···মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে :
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুহং হাতে ?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে ।
কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্র্যাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি ? গঙ্গা থেকে সব-কটা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকার ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—

তোমার শরীর ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালবো দেশলাই—
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলংকার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে ?

এক সন্ধেবেলা আমি

এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মুছে দিল তোমার মহিমা ;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বজ্র তোমাকেই পোড়ালো বীভৎস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই !···

*

নীরা, তুমি অমন সুন্দর মুখে তিন শো জানালা
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি ? না, ছিল না।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ···

কেমন সামান্ত হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি
কত লোভহীন—
পাগলামি ! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই।···

*

নদীর পাড়ে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শুকনো পাহাড় বললো আমায় নদীর কথা—
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শুধু বললো আমায় নারীর ভাষা।···

*

'এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ ছাখো ব্রিজ, ঐ ছাখো বাঁধ—'
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা।·

*

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটোমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট ;
ছোটোমাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম।

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

*

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে

কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে— তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাশ রেফ্
ও রয়ের ফুটকি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিঃশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি

*

এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

*

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না— আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,

শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়

তোমার শিয়রের কাছে যাবে— এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়— তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

*

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্নার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে

নিজস্ব চোখে তাকাবো।

তুমি জানতে পারবে না— তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

চোখ বিষয়ে

আমি তোমাদের কোন্ অনন্ত ছায়ায়
শুয়ে আছি, শুয়ে রবো, আমি তোমাদের
থেকে বহু দূরে তবু ছায়ার ভিতরে
শুয়ে আছি, জেগে আছি, শিয়রে ও পায়ে
ছায়া পড়ে, ছায়া কাঁপে, চোখের ছায়ায়
মাছ খেলা করে, ভাসে, আমি তোমাদের
মাছের মতন চোখ ছায়ার সাঁতারে
তুলে আনি, তোমাদের গোলাপজামের
মতো চোখ ভালোবাসি, মুখে দিই, দাঁতে
'তোমাদের' ভালোবাসাময় চোখগুলি
ভেঙে যায়, মিশে যায়, হেমন্ত বেলায়
শিরীষ ফুলের মতো তোমাদের চোখ
আমাকে পালন করে গোধূলি ছায়ায়।
'তোমাদের' শব্দখানি অনেক কুয়াশা
যেমন শব্দের কাছে নীরবতা ঋণী
যেমন নীরব ফুল সব বন্দনার
চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভ্রষ্ট ফুল যেমন বুকের
কাছে হাত জোড় করে, ছায়ায় শয়ান
ফুল ও বুকের চেয়ে কোমল পাছার
সঙ্গীতের মতো ভঙ্গি যেমন অনেক
দূর মনে হয়, আমি মনের কুয়াশা
'তোমাদের' মুখে রাখি, তোমাদের চোখ
কাজলের মতো লাগে, চোখে চোখে ছুঁয়ে
আমি দেখি, শুয়ে থাকি, যেন বিপুলের
ভিতরে নিঃস্বতা কাঁপে, চঞ্চলতা যেন
ছায়ায় গোপন, মুখ মুখশ্রী লুকোয়—
মুখের ভিতরে চোখ ভাঙে মিশে যায়।

দুপুরে রোদ্দুরে

জ্যোৎস্নার মতো শীতের রোদ, বাসের হাতল ধরে আমি দাঁড়িয়ে
রইলাম, ঋজু, পকেটে পঞ্চাশ, হাওয়া, বুক খোলা, ডানহাতে বইগুলি—
একটা কালো কোটপরা লোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েই
একজন স্ত্রীলোকের বুকে টোকা মারলো, স্ত্রীলোকটির উরু পর্যন্ত
লাল মোজা, খুবই অন্যমনস্ক দুটি আগ্নেয়গিরি তার বুকে, কাচের
এ-পাশ থেকে তার মুখ অন্ধকারে নিহত সারসের মতো, সে খুব
দুঃখিত স্বরে বললো, হ্যারিংটন (হু ওয়াজ হ্যারিংটন ?) স্ট্রীট, মনে
হল সে সারা সকাল ধরে কেঁদেছে, কেননা তার চূর্ণ চুলে রোদ পড়েছিল, সে
আমাকে দেখতে পায়নি। অদূরে যে থ্যাৎলানো পায়রাটাকে দেখে আমি
শিউরে
উঠেছিলাম, কালো কোটপরা লোকটির আড়াল থেকে সে তাও দেখতে পেল না
সে বললো, রোক্কে।
বাস অনেক দূর এসেছে, সে মরা পায়রাটাকে খুঁজে পাবে না।
রোকোকো কথাটা খুব সুন্দর। যেমন বুকলিক, কিন্তু প্যাস্টোরাল
নয়, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ তিনশো মাইল দূরে চলে গেল···
এখন হঠাৎ ময়দানে নেমে পড়লে আমি কি ফের রাখাল সেজে বাঁশি
বাজাতে পারবো ? 'ভালোবাসা ছিল ভালোবাসবার অনেক আগে'—
লম্বা গাছের মাথার উপরে ক্রেন ঝুঁকে আছে, নিখিলেশ কথা বলছে একটা
মেয়ের সঙ্গে, মেয়েটা পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে মেয়েটা
নিজের শরীরে কথা ঢোকাচ্ছে, আমি চলে যাবার এক মুহূর্ত
ওরা চোখ বুঁজে ছিল, ঋষিদের মতো স্বভাবতই নিখিলেশ চোখ বন্ধ করে থাকে।
অন্ধকারে লাল গোলাপ আমার ভালো লাগা চলবে না, কেননা
কমলবাবুর আগেই ভালো লেগেছে, কালো পোশাক ইয়েট্সের খুব পছন্দ
ছিল, তার চেয়েও খারাপ···দিনের আলোয় কেন ফুটেছিস শাদা ফুল ?
ছাদের টবে পেচ্ছাপ করেছিলাম, সেখানে তবু সুন্দর এক ঝাড় বেলফুল
ফুটেছে, না, লোকটা একটুর জন্য চাপা পড়লো না, আশ্চর্য লোকটার
হাতে একটা ক্যালেণ্ডার, ক্ষমা করুন, কে যেন বললো, না, .ক যেন বললো,

দয়া করুন, ক্ষমা করুন, না, না, চোপরাও, না, না— অসম্ভব
এমন দয়াহীন, দয়াপ্রার্থী মানুষের বীজাণু আমার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে
যাক আমি চাই না। আমি বরং রোদ্দুরে একা—

মায়াজাল

দেড়বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
চৌকো টেবিল, দু' পাশে নশ্বর আলোর পদরেখা
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দু' গজ দূর থেকে পরস্পর—
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নাকি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে, সুনীল?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাচে ছবিও ফোটে না!
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লুকিয়ে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূর ছুটে এলাম?

মৃত্যুদণ্ড

একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুর বেলা
বেজে উঠলো, বিদায়,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়,
বিদায়, বিদায় !
ট্রামলাইনে রৌদ্র জ্বলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি
হঠাৎ যেন এই পৃথিবী ডেকে দেখালো আমায়
কাঁটা বেঁধানো নগ্ন একটি বুক ;
রূপ গেল সব রূপান্তরে, আকাশ হলো স্মৃতি
ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত এক চোখের রশ্মি দেখে
অন্ধকারে মুখ লুকালো একটি অন্ধকার ।

হঠাৎ যেন বাতাস মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি এবং
গলির মোড়ের ঐ বাড়িটা, একটি দুটি পাখি
চলতি ট্রামের অচেনা চোখ, প্রসেশনের নত মুখের শোভা
সমস্বরে ডেকে বললো, তোমায় চিরকালের
বিদায় দিলাম, চিরকালের বিদায় দিলাম, বিদায় ,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়, বিদায়, বিদায় ।

নীরা ও জীরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা । এখন মাথার কাছে
জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো

ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে-দশটা বেজে যায়।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে-দশটায় আমি সব ভেঙেচুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ত্রি-করা পোশাক ও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা, থুক্ করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো। এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায়। এখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস। আমি
ব্রিজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনেছি, একদিন
আমূল ভাবে উপড়ে নিতে হবে অপবিত্র অমরত্ব।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখেছি বহুবার
আমার নতুন কবিতা এই রকম ভাবে শুরু হয় :
নীরা, তোমায় একটি রঙীন
সাবান উপহার
দিয়েছি শেষবার,
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়…
অসহ্য! কলম ছুড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর শিশুদের সঙ্গে
ফিরে এসে ঘুম চোখ, টেবিলের ওপাশে দুই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা

নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয় !

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন্ ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রুকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে, কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দুপাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না। ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডেভিড মহাশূন্যে
উড়ে যায়, উন্মাদ ! উন্মাদ ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,
সোনার রজ্জুতে
বাঁধা একজন ত্রিশঙ্কু, কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫,……থেকে ক্রমশ শূন্যে
এসে স্তব্ধ অসময়, উল্টোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশূন্য,
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অঙ্ক শুনেছিল ভগবৎগীতা আউড়িয়ে ?
কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু
ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ওঁ শান্তি ! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়াকি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি। আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য।

একবার হাসপাতালে যাও

একবার হাসপাতালে যাও সুস্থ একটি আপেলের মতো।
শায়িত মূর্তিরা সব তোমাকে ঠোক্‌রাবে চোখে চোখে
ছিমছাম নার্সেরা ঘুরবে, অবিশ্বস্ত নম্রতায় নত
দৈনিক চাকৃরির মতো আত্মীয়েরা মুহ্যমান ধরাবাঁধা শোকে।

কেউ বা যকৃৎরোগী, ফুস্‌ফুসে পোকা পুষছে কেউ
মাতাল গোরার হাতে হাড়ভাঙা কোণে একজন
ডেটলের কটুগন্ধ নিয়ে আসে সাময়িক বাতাসের ঢেউ—
এরা সব বেঁচে আছে, সাক্ষী আছে বুকের স্পন্দন।

তুমি এসে লঘু পায়ে বসো এক রোগিণীর পাশে
সুস্থ করতল দিয়ে একবার ছুঁয়ে দাও বিবর্ণ শরীর
দুধের অর্ধেক তাকে খেতে দিয়ে সরটুকু ফেলে দাও
অলীক বিশ্বাসে
দুই চক্ষু দিয়ে বলো : চিরদিন এই পৃথিবীর

একজন রোগার্ত থাকবে অন্যজন চিরদিন সুখের প্রতীক।
একজন বিকেলবেলা বহুদূর পথ ভেঙে হাসপাতালে এসে
মাটির মানুষ হয়ে বসে থাকবে, অন্যজন দুই হাতে জানালার শিক
ধরে থাকবে প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষার স্বাদ ভালোবেসে।

শব্দ : ২

আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ
যেন তাকায় অতিকুসীদ, যেন হরণ দাবি করে

যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ ওঁ শব্দ

অতিক্ষিদেয় খেয়েছিলাম সাতশো বিবেক, শব্দ বললো, 'আমি আছি'
শব্দ আমায় ট্রাম ভাড়া দেয়, বায়োস্কোপে টিকিট কাটে
খুনের রক্তে চোখ ভেসে যায়, দৈবে ঘুরি ঘোর ললাটে
অন্ধকারে মুখ দেখি না মুখের ভয়ে, শব্দ বললো, 'আমি আছি !' ওঁ শব্দ

আঠাশ বছর পবিত্রতার তুক শেখালো, বিনা সুদেই আগাম লগ্নী
ওঁ স্বর্ণ ওঁ প্রেম ওঁ বেশ্যা ওঁ মধু ওঁ ভূঃ ওঁ দুঃখ
ওঁ ছায়া ওঁ কাম ওঁ মায়া ওঁ স্বর্গ ওঁ পাপ ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর শিল্প ভেবে হাতে রইলো সবুজ খড়ি
এখন এলাম ঋণের ভয়ে ইস্টিশানে তড়িঘড়ি
কেউ দেখেনি শরীর আমার শরীরীভূত, জ্বলে উঠলো তবু হঠাৎ
নাদ অগ্নি। ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর অনুসরণ যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ মৃত্যুশব্দ। ওঁ শব্দ

'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী'

ছিলাম বাসনা লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্তপংক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে
আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী অগোপন
পাষণ্ড হয়ে যাই।

তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি !
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।

সে আমার হাত ধরে স্ফটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই সে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলনপ্রত্যাশী !

বহুদিন পর প্রেমের কবিতা

বুকের ভিতরে যেন মুচড়ে উঠলো একুশে এপ্রিল
একুশে এপ্রিল, ওকি চুলের ভিতরে কার ক্ষীণ বজ্রমুষ্টি ?
বিষম লোভের মধ্যে ছুটোছুটি—দূর শহর, অব্যক্ত মন্দিরে
ব্রিজের অনেক নিচে চাঁদ, আঃ সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্নায়
জলের বিমর্ষ শব্দ, এক আনার টিকিট পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছুলে ট্রেন, স্টেশনের একুশে এপ্রিল
রাত্রি দিয়েছিল।

চোরকাঁটা ভরা মাঠে মরা সাপ, যেও না ডিয়ার
আর ওদিকে, দূরে কাছে কোথাও বা অপর সাপের
অসহবাসের কষ্ট অতি বিষ হয়ে আছে, আমি
মেয়েসাপ বড় ঘৃণা করি···এত চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে
এমন সতেজ গন্ধ···অথবা কি বী-হাইভ ব্রাণ্ডির ?
কখন খেয়েছো ? আঃ ! হোল্ড মি টাইট, আঃ, এমন ধারালো
নোখ রেখো না, উঁ, আ, হুঁ হুঁ উঁ, আঃ, আঃ, আ—
বিষ নেই, আমার ঠোঁটে বা জিভে বিষ নেই, মৃত্যু নেই, আ—
হোল্ড মি টাইট ডিয়ার,···আমার শরীর নেই কাকে ধরবে, আ—
বিষ দিও না ঠোঁটে, প্লিজ, জরায়ুর মধ্যে একটা বিষপিণ্ড দিও না
আ—উঁ, হুঁ, হুঁ, উঃ, লাগে লাগে, আঃ আরো মারো, আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে মারো'

•

'কে ছিল তোমার সঙ্গে মা শেরি, কে ছিল সেই একুশে এপ্রিল ?
ইংরেজি সোহাগ বাক্য কে বলেছে ? অত ভয়ংকর জ্যোৎস্নারাতে
মানুষ বিষম অন্ধকার হয়
চোখ মুখ চেনা যায় না, ভিজে ঘাসে শরীরে শরীর···
আই আম সিনা, সিনা দা পোয়েট, কে তোমায় বলেছিল ফিসফিসিয়ে, আমি ?
দেখো এই করতল, অবিশ্বাস কত রুক্ষ, এই চোখ দেখে বোঝা যায়
কতদিন পলক ফেলেনি, কলকাতা শহরে কোনো কবি নেই, সবাই পুলিশ
তাই ট্রাফিকের এত গণ্ডগোল, লণ্ঠন জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে কতটা সুবিধে
সকলেই জেনে গেছে,··· আমার মাথায় শীত, মাংসের বাজারে
ভয়াবহ নামডাক, সরলতা ছিল সেই সন্ধেবেলা, আজ
আমাকে আবার তুমি ডাক দেবে ? কোথায় নদীর সেই ছলচ্ছল শব্দ, দূরে
বিষণ্ণ মাল্লার গান··· সেদিনের কথা ভেবে কেন আজ খুনীর বদলে
বুক ভরে কুয়াশায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে, যেন একজীবন
গাছের ছায়ায় একা বসে আছি, কোনোদিন নারীর হৃদয়ে
হেলাইনি এই মাথা, বিস্মরণে এত কৃতঘ্নতা—
এবার ফিরিয়ে নাও একুশে এপ্রিল !
এবার ফিরিয়ে দেবো একুশে এপ্রিল আমি, ও মুকুট আমায় মানায় না।

হাওয়া এসে

নারী শুধু মুখ লুকোবার জন্য, যখন ঝর্নায় দেখি মুখ
তখন নারীর কথা মনে পড়ে, হাওয়ায় কার্পাসফুল ভেসে যায় ;
হলুদ আঁচল মাখা যুবতীর পাশে বসে দেখি ঐ কার্পাসের ওড়াউড়ি।
নদীর সম্মুখ
ঢেকে গেছে কুয়াশায়, শোনা যায় বন্যা-রোধ কামানের তুড়ি
আঁচল সরিয়ে রাখি বুকে ঠাণ্ডা মুখ—
হাওয়া এসে ঐ কার্পাসের মতো নিয়ে যায় গাঙ্গেয় সভ্যতা
'নারীকেও নিয়ে যায়' !

এই হাত ছুঁয়েছিল

আহা রে সোনার মূর্তি, ওকি অবিরল ঝরে যাবে
রাত্তিরে, রোদ্দুরে, বৃষ্টিপাতে, পরপুরুষের হাতে ?
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা স্থইচ্ ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাত ছুঁয়েছিল বহু কৃমি, বুকে বাঁধা পাশবালিশ, রক্ত, যেন
রক্তের লালায়
লোভহীন ডুবে মরা, এই হাত ছুঁয়েছিল অশ্রুহীন চোখের চিৎকার
এই হাত ছুঁয়েছিল
এই হাত
সুড়ঙ্গের মতো গলি, খুচরো টাকা নিয়ে ছুটে বিদ্যুতের মতো…
পিছনে জুতোর শব্দ, ঘুমন্ত আয়নার মুখে সিগারেট, এই হাত !

বুকের ভিতরে কোনো বাষ্প নেই, কুয়াশায় অন্ধকারে তবু দেখা হল
পুরোনো সিন্দুকে যেন লুকোনো গিনির মতো ঝলসে উঠলো চোখ

স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ, ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাতেও কেঁপে ওঠে!
ক' কোটি ডাক্তার আছে পৃথিবীতে! পরশুরামের মতো সবগুলোকে মেরে
ওদের রক্তের হ্রদে বেঁচে উঠতে চাই।
গাছের ছায়ার মতো জ্যোৎস্না, এই জ্যোৎস্নার ভিতরে কেউ বেঁচে নেই।
আকাশের নিচে গাছ, আঁধার পাতার ঝাড়, পাতার ভিতরে স্রোত, সেই
স্রোতের শিরায় নির্মমতা; আপাতত নির্মমতা আঁচল সরিয়ে
বলে, 'ঐ যে আলো, গেটে দাঁড়ানো মাসতুতো ভাই, আজ তবে যাই?'

যাও, আর কোনোদিন তুমি একা অন্ধকারে গ্রীবা
এনো না আমার কাছে, যাও, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
বহুক্ষণ থাকবো, আমি কুকুর আটকাবো, যাও, আজ ভয় নেই
আর কোনদিন নয়। আজ যাও, ভয় নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছি।

এবার কবিতা লিখে

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
এবার কবিতা লিখে আমি ঠিক রাষ্ট্রপতি না হলেও
ত্রিপাদ ভূমির জন্য রাখবো পা উঁচিয়ে—
মেষপালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী!

কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ব
মুরগীর দু ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়—
কবিতা লিখেছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই—
অথবা একটি নারী অগোপন, যাকে আমি প্রকাশ্যে রাস্তায় জ'ড় ধরে
দয়া চাইতে পারি।

লেভেল ক্রসিংয়ে আমি দাঁড়ালেই শুনতে চাই তোপধ্বনি
এবার কবিতা লিখে আমি আর দাবি ছাড়বো না
নেড়ি কুত্তা হয়ে আমি পায়ের ধুলোর থেকে গড়াগড়ি দিয়ে আসি
হাড় থেকে রক্ত নিংড়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষে চেয়ে মানুষের
চোখ থেকে মনুষ্যত্ব খুলে—
কপালের জ্বর, থুতু, শ্লেষ্মা থেকে কবিতার জন্ম উঠে এসে
মাতাল চণ্ডাল হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফের ছাই থেকে উঠে এসে
আমার একলা ঘরে অসহায়তার মতো হা-হা স্বর থেকে উঠে এসে
কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়েছি।

অচেনা

তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে…
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে…
বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা
আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে হঠাৎ নম্র-নেত্রপাতে
বেলগাছিয়ায় নেমে গেল রক্তগোলাপ হাতে
বাকিটা পথ রইলো শুধু ঘামের গন্ধ, ব্রিজের ধুলো
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে।

দেখা হবে

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে—
সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা কী শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে, চন্দন চন্দন
আমি বসে থাকবো দীর্ঘ নিরালায়!

প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমুলে জারুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম, শিরা-উপশিরা নিয়ে জীবনের কত বিজ্ঞাপন
তবুও জীবন জ্বলে, সমস্ত অরণ্য-দেশ জ্বলে ওঠে অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে, হরিণের ত্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে অন্বেষণ।

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে…এতকাল ডাকোনি আমায়
কাঙালের মতো আমি এত একা, তোমার কি মায়া হয়নি,
শোনোনি আমার দীর্ঘশ্বাস ?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস !…

আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এলো, তাই আমি আগুন জ্বেলেছি,
সে কি ভুল ?
শুনিনি তোমার ডাক, তাই মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করেছি, সে কি ভুল ?
আমার অনেক ভুল, অরণ্যের একাকিত্ব, অস্থিরতা, ভ্রাম্যমাণ ভুল !

এবার তোমার কাছে—এ অন্য অরণ্য আমি চিনে গেছি
এক মুহূর্তেই
সর্ব অঙ্গে শিহরন, ক্ষণিক ললাট ছুঁয়ে উপহার দাও সেই
অলৌকিক ক্ষণ
তুমি কি অমূল-তরু, স্নিগ্ধজ্যোতি, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন
আমার কুঠার দূরে ফেলে দেব, চলো যাই গভীর গভীরতম বনে।

গহন অরণ্যে

গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
শুকনো পাতার ভাঙা নিশ্বাসের মতো শব্দ
তলতা বাঁশের ছায়া, শালের বল্লরী,
সরু পথ
কালভার্টে, টিলার জঙ্গলে একা বসে থাকা কী রকম নিঝুম বিষণ্ন
বড় হিংস্র দুঃখময়।
অসংখ্য আত্মার মতো লুকোনো পাখি ও প্রাণী, অপার্থিব নির্জনতা
ফুলের স্বর্ণরেখা গন্ধ, সামনে দীর্ঘ উৎরাই—
অসহিষ্ণু জুতোর ভিতরে বালি, শিরদাঁড়া ব্যথা পেতে দ্বিধা করে
কেননা বুকের মধ্যে চাপা হাওয়া, করতলে মুখ।
গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
তবু যেতে হয়
বারবার ফিরে যেতে হয়।

চিনতে পারো নি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না ?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতম ঘিরে
অনেক কথা

এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারো নি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই ত্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে ত্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারো নি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু' চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরন, কৈশোরময় তুমুল খেলা—
লুকোচুরির খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
ত্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

ছায়ার জন্য

গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনোদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে
এখন একটা কোনো প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই
যাঁর কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায়।
ভেবেছি অরণ্যে যাব—সমগ্র সমাজ থেকে প্রতিভূ বৃক্ষকে খুঁজে নিতে
সেখানে সমস্তক্ষণ ছায়া
সেখানে ছায়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই
যেখানে রক্তিম আলো নির্জনতা ভেদ করে খুঁজে নেয় পথ
মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসে কপিশ হিংস্রতা
গাঢ় অন্ধকার হলে আমি অসতর্ক অসহায়
জানু পেতে বসে বলবো,
বহুদিন ছায়ায় কেটেছে এ জীবন—
হে ছায়া, আমারই হাতে তোমার ধ্বংসের মন্ত্র
বুকের ভিতরে ছিল শ্বাস—তার পরিক্রমা ঘূর্ণি ছুনিয়ায়
ভূতলে অশুভ শব্দ, আঁচের মতন লাগে পাতার বীজন—
তবু শেষ বার
পুরোনো কালের মতো বন্ধু বলে ডাকো
বল্কল বসন দাও, রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।

দুটি অভিশাপ

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
প্রবল ঢেউ-এর মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মেল ট্রেনের গায় আমি খড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম
নারীর মুখ
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
এমনকি, সেই নারীরও চোখের তারা আঁকা ছিল না
এক স্টেশন পার হবার আগেই বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি
হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল আমার খড়ির শিল্প
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
মেল ট্রেনের অভিশাপ।

প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ?
শীতের সকালে খেজুর রস খেতে ভালো-লাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া?
প্রথম কৈশোরে সরস্বতী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ?
এসব বিষয়ে আমি এখনো মনঃস্থির করতে পারিনি
কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র ও মেল ট্রেনের অভিশাপ!

একদিন…

একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো,
অসমাপ্ত পাহাড়কে বলবো, আমরা এসেছি।
একটা শুকনো নদীর গর্ভে নেমে গিয়ে মরা ঝাঁঝি
হাতে তুলে নিয়ে বলবো, মনে আছে
ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোর মতন আনন্দ খেলা করবে শরীরে।
কোনোদিন জয়পুর যাইনি, কিন্তু জানি কোথাও জয়পুর আছে—
চিনতে আমার ভুল হবে না!
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা ভয়হীন মিনারে ঠেস দিয়ে
হাওয়া থেকে আঁচল ফিরিয়ে আনবে তুমি
তোমার মকর-মুখো স্বর্ণ কঙ্কণে রিনিঝিনি শব্দ উঠলে
আমি লীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে বলবো,
এবার অম্বা মন্দিরে ঠিক সাতটা ঘণ্টা বাজবে
শুধু শব্দ নয়, তার প্রতিধ্বনি, শুধু অর্জন নয়, তার উপহার
ফিরে আসবে তখন, কে যেন বলবে, জানতাম!
মর্মরে প্রতিফলিত মুখশ্রী প্রশ্ন করবে, সত্যি, সব মনে আছে?
আমি সব-কটা বোতাম খুলে হেসে বলবো,
বাঃ, জলের ধারে বসে থাকার ছবি কখনো মুছে যায়?
প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘ— এইরকম দুঃখহীন খুশীর মধ্যে
হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে শুনতে পাবো
রাজপুতানীদের মান-ভাঙার গান
কেউ উচ্চারণ করবে না, তবুও সবাই বলবে,
আঃ, কি সুন্দর বেঁচে আছি, উড়বে লাল রঙের ধুলো
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত মৃতেরাও জেগে উঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে
পাথুরে সবল রাস্তা যেখানে বাঁক ঘুরে ঢালু হয়ে নেমেছে
সেখানে আমরা থমকে দাঁড়ালে ভেসে আসবে তরতাজা দৃশ্যের ঘ্রাণ
ময়ূরের আত্মীয়ের মতন সন্ধ্যা অকস্মাৎ উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করবে:
এই নাও, আজ এই জয়পুর তোমাদের।

বাণী-বন্দনা

জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ
বড় বেশী তপ্ত অন্ধকার, আজ জাগার সময়
ওরে বিষের পুত্তলি, তোর এত ঘুম ?
পয়োমুখে বিষের ছুরির মতো জিভ, ঐ বিষ দৃষ্টি
ঐ দেহবল্লরীর বিষ ঘাম, এসবই তো এখন আঁধারে
মানুষের প্রাণ চায় ; বাণী, কুহকিনী'
আচমকা দুয়ার খুলে প্রেমিক ও পূজারীকে নীল করো
কবির দু'কানে ঢালো প্রার্থিত গরল আর শ্রেষ্ঠী কিংবা
রাজপুরুষের
ব্যাকুল ঠোঁটে ও মুখে ছোবলের মতো চুমু, লুব্ধ প্রতিহারী
তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে টানে গুপ্তবিষ, বিষ, বিষ
অন্ধকার বিষে ভরে যাক্
বাণী, ওরে বিষকন্যা, তোর নগ্ন শরীরের দুলে ওঠা মোহিনী মায়ায়
অ্যারিস্টটলকে তুই ঘোড়া কর্, সূর্যকে ভ্রূভঙ্গি হেনে
শিরোপালোভীকে তুই পদাঘাত উপহার দিয়ে
প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।
আজ মনে হয়
বাণী, তোর জেগে ওঠা সভ্যতার একমাত্র সূচিকাভরণ।

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে ?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে !
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশী
হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ—
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো ?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর !
অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিঁট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিক্সা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না !

আথেন্‌স থেকে কায়রো

বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো ?
পেঁজা তুলোর মতন তুলতুলে মুখ দু'জন হাওয়া-সখী ছুটে এলো
তখন মাথার ওপরে ও নিচে ভূমধ্য আকাশ ও সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ এবং রুপালি ফড়িং
পিছনে সন্ধ্যেবেলার ইওরোপ জলছে দাউ দাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার
আমি কর্কশভাবে বললুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ, আমি
আধঘণ্টা আগে পানীয় চেয়েছি,
তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা দুই যুবতী অপ্রতিভ ভাবে হাসলো
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাস্য খুব অবান্তর লাগে
তাদের শরীরের রেখাবিভঙ্গের দিকে চোখ পড়ে না
ভূমধ্য সাগরের অন্তরীক্ষে নিজেকে বন্ধনমুক্ত ও সরল সত্যবাদী
মনে হয় অকস্মাৎ—
পিছনে জলন্ত ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি নিঃসঙ্গ ভারতীয়, আমি সম্রাটের বিবাগী পুত্র
সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশে এখন আমি তীব্র কণ্ঠে বলতে চাই,
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে
আমি আর সহ্য করতে পারছি না—
আমি কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছি।

ডাকবাংলোতে

ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর
কণ্ঠে মুক্তামালা
মরি মরি
তোমরা আজ সকালবেলার প্রসন্নতা
একমুহূর্ত শিশির ভেজা আলো
নর্মছলে তোমরা অপ্সরী।

*

'কি সুন্দর ঐ টগর ফুল দুটো—
খোঁপায় গুঁজবো আমি!'
প্রাক্-যুবতী বারান্দার প্রান্তে এসে আঁখি তুললো—
সদ্য ভোর, বিরল হাওয়া, ঠাণ্ডা রোদ
সাংকেতিক পাখির ডাক, উপত্যকায় নির্জনতা
আমি বেতের ইজিচেয়ারে অলস।
ফুলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নারীর দিকে
চোখই জানে চোখের মায়া, দৃষ্টি জানে সৃষ্টির পূর্ণতা
একটি চাবি যেমন বহু বন্দী মুক্তি,
চাবির মতন
এক পলকের চেয়ে দেখা
বললো আমায় :
নারী যতই রূপসী হোক, এই মুহূর্তে মুকুটহীনা।

*

চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে
টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে
আমি হাত বাড়িয়েছি
হাত থেমে রইলো শূন্যে
পৃথিবী কাঁপে না, তবু কখনো কখনো মানুষের
ভূমিকম্প হয়

এত বাতাস, তবু দীর্ঘশ্বাস নিতে ইচ্ছে হয় না
ভুবনময় এই মোহিনী আলোর মধ্যে জ্বলে ওঠে বিষণ্ণতা
হাত থেমে রইলো শূন্যে
টগর গাছের পাশে হলুদ সাপ
চোখে চোখ, হিম সম্ভাষণ
কি তথ্য এনেছো তুমি, প্রহরি ?
হলুদ সাপ সকালের মূর্তিমতী স্তব্ধতাকে ভেঙে
সেই ভাঙা-গলায়
বলে উঠলো :
ঘূর্ণী জলের পাশে একদিন দেখে নিও
মুখের ছায়ায় রৌদ্র-ভ্রমরীর খেলা !

কেউ কথা রাখে নি

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল, সেই বোষ্টমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও, দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে !

নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে ?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারি নি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণকঙ্কণ-পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি !
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…

বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না !
বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে !
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্নতন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখে নি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোন নারী !
কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না !

শব্দার্থ

এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে
চালের বাজারে বড় খুনসুটি, চালের ভিতরে বহু হাত
চোখ ও নিশ্বাসময়, পাথর ও কীট-ভরা, তবুও সুগন্ধ ;
বালকের ভীরু হাত থলি খোলে, চেয়ে দেখে ওজনের কাঁটা—
জলস্থল অন্তরীক্ষ আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের সুশিক্ষার দৃশ্য
সিকি দিতে তারাই শিখিয়ে দেয়, ওপরে চাপায় সজনে ডাঁটা

মেঠো পথে ফিরে আসে। সুবোধ বালক, তুমি ও চাল খেয়ো না,
বিক্রি করো, কিলো-তে আটআনা লাভ, সেই ভালো, শোনো,
চাল হলো শব্দ, কিন্তু তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে
শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। শব্দ নয়, অর্থই তো শিক্ষার মহিমা।
এখন ইস্কুল বন্ধ, তবু দিন দিন বাড়ে বালকের সুশিক্ষার সীমা।

নদীর ওপারে

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে
মুখে ভেজা হিম হাসি
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আর আমি পাশা খেলতে ভালোবাসি না
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
আগুনে ঘিয়ের ছিটে দিয়ে তুলবো প্রলয় নিনাদ-

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে
মুখে ভেজা হিম হাসি ?
হিরণ্ময়, ওকে বলো, শর্বাণীর চিবুকে ঐ যে কাটা ঘা
ভনভনাচ্ছে নীল ডুমো মাছি
ওরা কি মৃত্যুর দূত ? আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না—
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
ওকে শেষবার বলো, রাত্রির আগেই যেন মৃত্যুদূত নীল ডুমো মাছি
উড়ে যায় প্রত্যুষের দিকে !

ছেলেটা

ঐ ছেলেটা পাগল,
ওর কথার কোনো মাথামুণ্ডু, ঠিকানা নেই !
ঐ ছেলেটা সমুদ্রেরও সীমানা চায়,
নদীর কাছে হাজির হয়ে
নদীকে খুব সরল হতে মিনতি করে ;
ভিখারীকেও ত্যাগ শেখাতে চেয়েছিল, ঐ ছেলেটা এমন পাগলা,
মৃত্যু দেখে শৈশবে যায়,
লেবু পাতার গন্ধে নাকি অমরত্ব !
নারীর বুকে শপথ রেখে ভেবেছিল, পাখির মতন পবিত্র প্রেম
হাওয়ায় উড়বে
হাওয়ায় উড়বে চোখের জল, যুদ্ধ যেমন মানুষকে খুব
হাসিয়ে মারে,
ঐ ছেলেটা মানুষ দেখলে ধুলো কাদায় ছবি আঁকবে
ধুলো কাদাই ছিটিয়ে বলবে, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম—

পৃথিবীময় গোপনকথা, পৃথিবীময় গোপনকথা
অসুখ, সুখ, জননীমুখ, আকাশবাণী, ভোরের কাগজ
ভরিয়ে শুধু গোপন কথা
আলিঙ্গনে এত গোপন, রাজধানীতে এত গোপন
মানুষভরা গোপনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ ছেলেটা
বিষের ভাণ্ড নিয়ে বিমান থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে
শূন্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে, আকাশ, হিম-বাতাস থেকে
চোখ সরিয়ে
সভ্যতাকে ডেকে বলে—
ঐ ছেলেটা সভ্যতাকে হাসতে হাসতে থেকে বলে,
আমায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করো।

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি। আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া
মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন। মহিলা না, নীরা।

তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্নার শব্দ ওঠে। এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্না—ধূল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।

ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি। সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু' চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ-শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরীচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যূষ যেন রাত্রি ভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুম কুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন!

কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি
বেঁচে থাকা এই রকম
আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোলাপচারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিন্যাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত।
ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা।

জয়ী নই, পরাজিত নই

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি—
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টন্‌টন্‌ করে ওঠে
হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন
সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আদিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ

কিছু নিচে ছুটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায় চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা--এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্নার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোল্‌কা ডট্ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাব্‌লা গাছের শুকনো কাঁটাও দাবি করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব।
সব দৃশ্যই এখন নিরপেক্ষ
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনিই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।

পাথর

খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস্ সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে?
অথবা তোর ভিতরে, অনেক ভিতরে, শিশুর রক্তাভ হাত যেমন কোমল
সেই কেন্দ্রে
অযুত বর্ষ সুপ্ত রয়েছে যে স্তব্ধতা, তাকেই অটুট রাখার নেশা
ঢের বেশি বড়?

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টল্‌মল্‌
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয় হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলি মাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি :
নীরা, তুমি শান্ত হও
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও !
নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ !
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টল্‌মল্‌ ।

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়মকানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলায় আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাচের চুড়ি ভাঙার মতই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিনদুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুনকালি দিই।
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করি মুর্গীহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে
মনুমেণ্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগে না।

জলের সামনে

ব্রিজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি,
কখনো মানুষ নই,
তবুও সন্ধ্যায়
ব্রিজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা
পরস্পর মুখ ;

মানুষ দেখেছে জল বহুদিন মানুষ দেখেছে অশ্রুজল
মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা, ব্রিজের অনেক নিচে
হিম কালো জলে
কালো জল বহু উর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো।
আসমুদ্র দয়াপ্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন মানবীয়।
জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলজ্জ্য শরীর
মাতৃগর্ভ বাস সম অগোপন;
অথবা না-হোক একা,
বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে; একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কী রকম আশ্চর্য সরল—
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো,—সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম
মানুষের হাত
জলের ভিতরে গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়,
জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন; বাতাসের মতো জল, পরাগ ছড়ায়।
কখনো মানুষ সেজে সঙ্গীত সমেত আমি বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফস্‌ফরাস,
দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসে—
এমন উচ্ছল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ!
মানুষের ছদ্মবেশে আছি, তাই চোখে আসে অশ্রু
মুখ ঢাকি।

জীবন ও জীবনের মর্ম

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।
বুদ্ধের বুকের হাঁস ডানা ঝাপটায়, আমি মাংসলোভী

বিশাল বৃক্ষের ছায়া জলে ভাসে— আমি তমস্বান হয়ে ছুটে গেছি
আমি ভুল বুঝতে পারি—
বিস্মৃতিকে কতবার মনে ভেবেছি বিষণ্ণতা
ট্রেন লাইনের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বনবাসী হরিণ
কয়লাখনির ভিতরের অপরাহ্ণের মতন উদাসীনতা
আমাকে নদীর পাশেও স্রোতহীন রেখেছে
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে গেছে কৃতঘ্নতার হাসি
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে, সেই মুহূর্তের
বিশাল জ্যোৎস্না যাবতীয় পার্থিব ম্যাজিকের
তাঁবুর মতন ঝড়ে উলটে যায়
মেঘ জলস্তম্ভ হতে গিয়েও ফেটে ইলশে গুঁড়ি হয়ে ছড়ায়
সমগ্র কৈশোর কালের নদীর পার থেকে ছিটকে পড়ে যায়
গুন টানার মানুষ
বারো বছরের জন্মদিনে আমার কপালে মায়ের আঙুল ছোঁয়া
লাল টিপ
মুছে গিয়েছিল কান্নায়, মুছে যায় নি।
এখন আমার ভারতবর্ষের মতন ললাটে সেই কাশ্মীর, অর্থাৎ দ্বিধা
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

শব্দ

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রুপালি ফল, নীল মিছিল, চিড়িক চক্ষু…

চিড়িক না সুখ? চিড়িক শব্দে চ্যাঁড়া বসালুম
রুপালি ফল, না রুপালি উরুত? দ্রিদিম জ্যোৎস্না
অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়
দ্রিদিম না স্মৃতি? জ্যোৎস্না না জল? অথবা সাগর?
দ্রিদিম সাগর? ঠিক ঠিক ঠিক! নিরুপদ্রব। শূন্য হাস্য
কুনকি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্
তামস? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম
থরথর করে)
তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অর্থের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলুকুলু জল…

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘণ্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও।

নিসর্গ

আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত
উড়ে গেল তিনটে প্রজাপতি
একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিল বিকেলের দিকে
সূর্য খুশী হয়ে উঠলেন,
তাঁর পুনরায় যুবা হতে সাধ হলো।

দ্বারভাঙা জেলার রমণী

হাওড়াব্রিজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল
দ্বারভাঙা জেলা থেকে আসা এক টাট্‌কা রমণী
ব্রিজের অনেক নিচে জল, সেখানে কোনো ছায়া পড়ে না
কিন্তু বিশাল এক ভগবতী কুয়াশা কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চল থেকে
গড়িয়ে এসে
সভ্যতার ভূমধ্য অলিন্দে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ থেকে খসে পড়লো ইতিহাসের পাপমোচনকারী বিষণ্ণতা
ক্রমে সব দৃশ্য, পথ ও মানুষ মুছে যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু রইলো সেই
লাল ফুল-ছাপ শাড়ি জড়ানো মূর্তি
রেখা ও আয়তনের শুভবিবাহমূলক একটি উদাসীন ছবি—
অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, সেই প্রধানা মচ্‌কা মাগি, গোঠের মল ঝামরে
মোষ তাড়ানোর ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে-রে—
মুঠো পিছলোনো স্তনের স্বর্ণমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা
পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম
অ্যাক্রোপলিসের থামের মতন উরুতের মাঝখানে
ভাটফুলের গন্ধ-মাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া
ডৌল হাত তুলে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে-রে—
তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে
তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তিমূল্য পেয়ে গেছে…
সব ধ্বংসের পর
শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো
কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।

উত্তরাধিকার

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস-ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ ক্রোধ শিহরন
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা-কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলস্
অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা-কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু' তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এসবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশী তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মত্যে—
নীরা দু' হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ !
ওরা আমার বিষম চেনা !'
ঘূর্ণী ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুক চাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না !

বন্দী, জেগে আছো ?

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে :
বন্দী, জেগে আছো ?
বন্দী কি ঘুমোয় ? নাকি জাগরণই তার বন্দীশালা
মাথার ভিতরে জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনুপল
পদক্ষেপে শিকলের শব্দ— তার নিঃসঙ্গতা, অন্ধকুঠুরির
ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে
জানায় অস্তিত্ব, এ কি নিষ্ঠুরতা—যে রয়েছে চিরকাল
জেগে, তাকে প্রশ্ন
বন্দী, জেগে আছো !

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিংস্র কঠিন মুখ
গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তারও কপালের নিচে
প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর ;
সমূহ প্রকৃতি থেকে যে রয়েছে দূরে তার আঁধারে ঝলসানো চোখ
প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে পিপাসায়, লোভে
অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে
প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় :
স্বাধীন ? স্বাধীন ?

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ংকর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রিজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক
তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়
মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কণ্ঠস্বরেও
কোনো সার্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না

তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকার মতো চিবুকের রেখা
কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ংকর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজী স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ কি সুন্দর !

ধান

হলুদ শাড়ি আর প'রো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
ঘরে তোমার হলদে পর্দা ! মিনতি করি খুলে রাখো
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।
এপাড়া জুড়ে সানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে-হলুদ
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

আয় কাক আয় কাকের পাল আয়রে আয়—
গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ডাকে পুরোনো সুরে
ও খোকা, তুই কাক ডাকিসনে, ও ডাক যে অলুক্ষুনে
এ বছর আর নবান্ন নেই, বান এসেছে
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি।

দুপুরবেলা হলদে হাওয়া উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কোথাও কেউ কথা বললে অভিমানের তুফান ওঠে
পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে হিম নিশীথের নীল জ্যোৎস্না
গায়ের পাতা হলুদ হয় তবুও ভয়ে
মায়ের মুখ শিশুর মতো, জলে যেমন মেঘের ছায়া, থম্থমে ভয়—
ও মা, তুমি ভয় পেও না
শিশুর অন্নপ্রাশন হবে রক্ত আলোর গোধূলি বেলায়।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ!
জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু— সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি— সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো?
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি? না কালো?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি

তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি :
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে ?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো ?

সিঁড়ির ধাপের মতো বিস্মরণ বহু দূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল ?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি।

সারা জীবন বেড়াতে এলে

ব্রিজের নিচে মানুষ, তুমি
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ফাঁকা জীবন, হলুদ ঘর, নোংরা জলে মেয়েলি তুলো
শরীরময় টুকরো ছিট, চুলের গন্ধ ঝাউবনের
অসমীচীন মানুষ, তুমি সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ঘৃণায় কাঁপে শরীর আমার, ভ্রমণ এত মাধুরীহীন ?
তিরতিরিয়ে রক্ত ছোটে— ভ্রমণ শুনলে জলপ্রপাত
ভ্রমণ শুনলে চুরি-সোহাগ, ভ্রমণ শুনলে রৌদ্রছায়া
নগর ভরা নারীর হাস্য, হীরের গয়না, কালো রুমাল
সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্না, সহ্য হয় না ট্রেনের ঘণ্টা
ব্রিজের নিচে মানুষ তুমি বাদামী মুখ,
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?

আরও নিচে

সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে, পাথরের
সিঁড়ির ওপর বসে থাকি
একা, চিবুক নির্ভরশীল
চোখ লোকচক্ষু থেকে দূরে।
'সম্রাটের চেয়ে কিছু কম সম্রাটত্ব' থেকে ছুটি নিয়ে আজ
হলুদ দিনাবসানে পরিকীর্ণ শব্দটির মোহে
মাটির মানুষ হতে সাধ হয়। এক-একদিন একরকম হয়।

আমার চোখের নিচে কালো দাগ
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যে রকম জাদুদণ্ডসম কোনো
মহিলার মতো
নিয়তি বদল করে, আলো-ছায়া-আলো ঘোরে শরীর নিভৃত সানুদেশে
দপ করে জ্বলে ওঠে হৃদয়ের পুরোনো বারুদ
তেমনই দিনাবসান
তেমনই মোহের থেকে মুক্ত নিচু চাঁদ—
সিংহাসন থেকে নেমে, হাত ভরা পশমের মতো রোমশ স্তব্ধতা।

পাথরের মসৃণ বেদীর নিচে রুক্ষ মাটি, একটু দূরে পায়ে চলা পথ।
সম্রাটের শেষ ভৃত্য চিরতরে যেখানে শয়ান
তার চেয়ে দূরে, সীমার যেখানে শেষ
যেখানে উদ্ভিদ, জল মেতে আছে পাংশু ঈর্ষায়
যেখানে বিশীর্ণ হাত কাদার ভেতরে খোঁজে বালির ফসল
তার চেয়ে দূরে
যেখানে শামুক তার খাদ্য পায়, নিজেও সে খাদ্য হয়
ভেসে যায় সাপের খোলস, সেখানেও
আমার অতৃপ্তি বড় দীর্ঘশ্বাস বিষদৃষ্টি নিয়ে জেগে রয়—
মুকুট খোলার পর আমি আরও বহুদূরে নেমে যেতে চাই।

তুমি

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে?
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি,
বাথরুম থেকে এলে সিক্ত পায়ে, চরণকমলযুগ চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল—
তিন মাইল দূরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি, পূজার ফুলের মতো ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সেমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপটিক খৃষ্টান

আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিঃশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কশ্যপের পাশে রেখে আসি।

এ-রকম পূজা হয়, দেখো ত্রিশিরা ছায়ায় কাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, রূপের কঠিন ঋণ বিশাল মেখলা
আমি ঋণী, আমি ক্রীতদাস নই, আরাধনা মন্ত্রে আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ করে যাবো।

কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি

সাদা বাড়িটির সামনে আলো-ছায়া-আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে
এখন দুপুর রাত অলীক রাত্রির মতো, অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে-রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ;
যে স্তনে লাগে নি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়
এই সেই অরুণা ও রুনি নাম্নী পরা ও অপরা
সুখ ও অসুখ নিয়ে ওষ্ঠাধর, এখন রয়েছে খুব ঘুমে
যে-রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে-ঘুম স্পষ্টত খুব নীল।

•

সন্ন্যাসীর সাহসের মতো শান্ত অন্ধকার, কে তুমি কঙ্কাল—
প্রহরীর মতো একা, কেন বাধা দিতে চাও ? কী তোমার ভাষা ?

ছাড়ো পথ, আমি ঐ সাদা বাড়িটির মধ্যে যাবো।
করমচা ফুলের ঘ্রাণ আলপিনের মতো এসে গায় লাগে
থামের আড়াল থেকে ছুটে এলো হাওয়া, বহু ঘুমের নিশ্বাস ভরা হাওয়া
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্য রাতে
অরুণার শাড়ি ও সায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী জন্মের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী।

নিরস্ত্র কঙ্কাল, তুমি কার দূত? তোমার হৃদয় নেই, তুমি
প্রতীক্ষার ভঙ্গি নিয়ে কেন প্রতিরোধ করে আছো?
অরুণা ঘুমন্ত, এই সাদা বাড়িটির দ্বারে তুমি কেন জেগে?
তুমি ভ্রমে বদ্ধ, তুমি ওপাশের লাল-রঙা প্রাসাদের কাছে যাও
ঐখানে পাশা খেলা হয়, হু-র-রে চিৎকার ওঠে, হৃদয়ে হৃদয়ে শকুনির ঝটাপটি,
তুমি যাও
ছাড়ো পথ, আমি এই নিদ্রিত বাড়ির মধ্যে যাবো।

নিরাভরণ

পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা?
তুমি তা হলে পিছনে থাকো
বন্ধু ছিলে উদাসীনতা, তোমারও সাধ গৃহী হতে?
ডাইনে যাও
পোশাক, তুমি ছিন্ন হবে? শান্তি, তোমার তৃষ্ণা পাবে?
জিরোও এই গাছের নিচে
হলুদ বই, সাদা বোতাম, কৃতজ্ঞতা, চাবির দুঃখ, বিদায় দাও
আমার আর সময় নেই, আমি এখন
পেরিয়ে মজা দিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে
দিগন্তের চেয়েও একটু দূরে যাবো।

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূর নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যে-রকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে-রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এরকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর। যমুনা আমার সঙ্গী— সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু
তুমি নও?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত?
তুমি নও ক্ষীণ ধূপ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের নিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
হয়, পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী,
তুমি এরকম? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার নমুনা।

হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করে, এসো, হাত ধরো।
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াৎ, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর !
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন স্বদেশ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো;
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকেলের পুরস্কার…

আয় খুকী, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি।

অভিমানিনী

ছিল নিঝঝুম পুষ্করিণী
জলে নামলো কে ?
এলো যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে !
বুক জলে যায় আড় পানে চায়—
যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে শুধু সূয্যি।
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি
ভোমরাপানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাকপক্ষী
পুটুস করে সূয্যিও যে
মুখ লুকিয়ে সাদা—
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা।

পৃথিবীর নিচু কোণে

পৃথিবীর নিচু কোণে, এই কলকাতার খুব অন্ধকার প্রান্তে
এক প্রাচীন গুহায়
শুয়ে আছি—
প্রতিদিন ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হয়।
বিষণ্ন বিকেল উঁড়ে যায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারের খুব কাছাকাছি স্বর্গে
শিশুর ওষ্ঠের মত তরল অরুণ শুধু
চুঁইয়ে পড়ে
গীর্জার ঘড়িতে
দমকল ছুটে গেলে আরতির ঘণ্টা বলে ভ্রম হয় না
অরণ্যের শুক্লপক্ষ নগরের পূর্বজন্ম স্মৃতি হয়ে ভাসে।
বাঁ হাতে বিষম ব্যথা, চোখে লাল ছিট
আমি
আহত বিমর্ষ গুহাবাসী
নারীর ঈর্ষার মত ধারালো পাথরে ঠেস
দিয়ে রাখা
ইহকালময়
দুই অবসন্ন কাঁধ
রক্ত গন্ধ, উপচ্ছায়াময় রক্ত গন্ধ, যৌবনের হরিৎ বিষাদ।
পশমের মত কালচে-নীল রোঁয়া
তরাই ভাল্লুক তার দুই থাবা তুলে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে—
ঝলসে ওঠে মার্বেলের মতো দাঁত
চাপা গর্জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জেদ—
রাগ নয়, আমার বিষম অভিমান হয়
রাগ নয়, আমার বিষম অভিমান হয়—
নিরস্ত্র অশক্ত আমি,
এই কি দ্বন্দ্বের যোগ্য কাল?

গুহা ছাড়বো না, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি
তীব্র ধিক্কারের চোখে
ভাল্লুকের দিকে চেয়ে থাকি—
কাপুরুষ !

পাঁশুটে হাওয়ার মধ্যে রক্তগন্ধ,
উপচ্ছায়াময় রক্তগন্ধ, যেন
বজ্রকীট ভেদ করে ছদ্মবেশী উরু ।
ম্লান চৈত্রসন্ধ্যা থেকে ভেসে ওঠে ভ্রষ্টা রমণীর
গুপ্ত হাহাকার
টালিগঞ্জ থেকে দূর বেলগাছিয়াময় এক অরণ্যের
পূর্বজন্মস্মৃতি
হরিৎবর্ণের মধ্যে ছোপছোপ ধূসরতা দেখে হিম হয় ।

চে গুয়েভারার প্রতি

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অবিশ্রাম বৃষ্টি পতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যাণ্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে

সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় !
শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলে কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে
সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেপে প্রবল হুংকারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে !

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, আমি মেনে নিইনি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে
আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো !
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারি নি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় !

মাল্লা

নৌকায় মাঝি চারজনা, হাল দাঁড় মোটে তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা, দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী।
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায় নায়ের গলুই দক্ষিণে
একজনা হাসে তিনজনা ভাবে, বায়ু চলে যায় পথ চিনে ॥

বিজ্‌লি হানলো আকাশ দু'খান জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড়গা চোখ বুঁজে।

হাসন্ রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার চ্যাঁড়াক্যাড়া— মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা ত্থাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসন্ রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদ্‌লা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে দুলায়ে কোমর
যা বেটী হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি।

কও তো হাসন্ রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি ?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা!

জানুতে ঠেকায়ে থুত্‌নি হাসন্ চিন্তায় বসে,

মুখে তার মিটিমিটি হাসি

কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন্ আশমান

ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে

ছয় দাসদাসী

শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও আগে দেখে লই

পদ্মের নক্‌শায় পইড়লো কিনা শেষ টান।

বিদেশ

ঠোঁট দেখলে বুঝতে পারি, তুমি এ-দেশে বেড়াতে এসেছো

ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এ দেশী নয়—

কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক

ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয়!

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়

আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর

তোমার পা মাটি ছুঁলো না

তোমার হাসি পাখি— তুলনা

তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক!

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি

ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি

তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি!

রুক্ষদিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা

আগুন থেকে জ্বল আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা

তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে

বাজালে করতালি!

এ পৃথিবী বিদেশ তোমার,

কত দিনের জন্য এলে ?

বেড়াতে আসা, তাই তো মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া !

যদি তোমায় বন্দী করি,

মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি

দেবতা রোষে হব ভস্ম ধোঁয়া ?

চন্দনকাঠের বোতাম

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি

যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছি বহুবার কখনো কোনো প্রার্থনা জানাইনি,

যেমন নারীর কাছে মৃত্যুকে সমর্পণ করেছিলাম

মৃত্যুর কাছে নারীকে

যেমন বৃক্ষের কাছে জহ্লাদের মতন গিয়েছি কুঠার হাতে

উপকথার কাঠুরেকে করেছি উপহাস

যেমন মানুষের কাছে আমিও মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিলাম

কৃতজ্ঞতার বদলে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ

যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজের শৈশব দেখেও চিনতে পারিনি

লোকের মধ্যে শিশুকে আদর করেছি লৌকিকতাবশত

ডাকবাংলোর বন্ধ দরজার সামনে চাবির বদলে হাতুড়ি চেয়েছিলাম

যেমন ঝামরে-পড়া অন্ধকারের মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মেখে

এসেছিলাম আলোর কাছে

যেমন কুকুরের দাঁতে বারবার ছুঁয়েছি স্তন ও ওষ্ঠসমূহ

আলজিভ-ছোঁয়া চুম্বনেও তৃষ্ণা মেটেনি

যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম এক বোবা-কালা

প্রেত

যেমন বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত্রে গলা মুচড়ে মেরেছিলাম ধবল হাঁস

কান্না লুকোবার জন্য নদীতে স্নান করতে গিয়েছি
যেমন অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর মনে হয়েছিল আমার পূর্বজন্মের চেনা
অত্যন্ত মমতায় আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম রুপো বাঁধানো আয়না
যেমন ফিরে আসবো বলেও ফিরে যাইনি বেশ্যার কাছে
সমুদ্রের কাছেও আর যাইনি
ফিরে যাইনি ধলভূমগড়ের লাল ধুলোর রাস্তায়
দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতা ধাই-মার কাছেও যাওয়া হয়নি
যেমন ঠিকানা হারিয়ে বহু চিঠির উত্তর লেখা হয় না
তবুও জেগে থাকে অভিমান
যেমন মায়ের কাছেও গোপন করেছি শরীরের অনেক অসুখ
যেমন মনে মনে গ্রহণ করা অনেক শপথ কেউ শুনতে পায়নি বলেই মেনে চলিনি
যেমন কাঁটা বেঁধার পর রক্তদর্শনে সূর্যাস্তের আবহমান দৃশ্য থেকে ফিরে আসে চোখ

তেমনই এই চৌত্রিশ বছরে এক ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে আমার চকিতে দিকভ্রম হয়
বৃক্ষসারি ছুটে যায় আমার আপাতগতির বিপরীত দিকে
পুকুরে স্নানের দৃশ্য মুহূর্তের সত্য থেকে পরমুহূর্তের অলৌকিক
আমার বুক টনটন করে ওঠে অথচ নির্দিষ্ট শোক নেই
সেজন্য সান্ত্বনার কথা মনে আসে না
আয়ুর সীমানা কেউ জানে না, তাই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি
কিন্তু মুহূর্তের সত্যেরই মতন, সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ে
কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতি প্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম
এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ
শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে
আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে।